দেখা না-দেখা

হুমায়ূন আহমেদ

দেখা না-দেখা

হুমায়ূন আহমেদ

Dekha Na-dekha

by Humayun Ahmed

ANYAPROKASH publication

ISBN 984 868 429 8

হুমায়ূন আহমেদ

দেখা না-দেখা

অন্যপ্রকাশ

তৃতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৭
দ্বিতীয় মুদ্রণ | একুশের বইমেলা ২০০৭
প্রথম প্রকাশ | একুশের বইমেলা ২০০৭

© | লেখক

প্রচ্ছদ | মাসুম রহমান

প্রকাশক | মাজহারুল ইসলাম
অন্যপ্রকাশ
৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১

মুদ্রণ | কালারলাইন প্রিন্টার্স
৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা

মূল্য | ১৬০ টাকা

আমেরিকা পরিবেশক | মুক্তধারা
জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক

যুক্তরাজ্য পরিবেশক | সঙ্গীতা লিমিটেড
২২ ব্রিক লেন, লন্ডন, যুক্তরাজ্য

সিঙ্গাপুর পরিবেশক | শহীদ ট্রাভেলস এন্ড ট্যুরস প্রাঃ লিঃ
১৮১ কিচেনার রোড, ০১-১২/১৩ নিউ পার্ক হোটেল
শপিং আর্কেড, সিঙ্গাপুর ২০৮৫৩৩

Dekha Na-dekha | Humayun Ahmed
Published by Mazharul Islam
Anyaprokash
Cover Design : Masum Rahman
Price : Tk. 160.00 only
ISBN : 984 868 429 8

নিষাদ হুমায়ূন

তুমি যখন বাবার লেখা এই ভ্রমণ কাহিনী পড়তে শুরু করবে তখন আমি হয়তোবা অন্য এক ভ্রমণে বের হয়েছি। অদ্ভুত সেই ভ্রমণের অভিজ্ঞতা কাউকেই জানাতে পারব না। আফসোস!

ভূমিকা

আমি ভ্রমণ বিলাসী মানুষ না। পাসপোর্ট হাতে প্লেনের দিকে রওনা দিলেই বুক ধড়ফড় করে এবং গভীর হতাশায় বলি, কেন যাচ্ছি? এই সমস্যার সমাধান বর্তমানে হয়েছে। এখন দেশের বাইরে যখন যাই একদল সফরসঙ্গী থাকে। মনে আছে, নেপালে গিয়েছিলাম ৩৩ জনের এক দল নিয়ে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় রোল কল করতে হতো এমন অবস্থা। একা একা পাহাড় পর্বত দেখার চেয়ে সবাইকে নিয়ে দেখার আনন্দই অন্যরকম। বিশেষ করে দলে যদি শিশু থাকে। পৃথিবী দেখার চোখ এদের অন্যরকম। এরা অনেক কিছু দেখতে পায় যা আমরা পাই না। আনন্দের কথা, আমার এবারকার প্রতিটি ভ্রমণেই শিশুরা ছিল।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর

"উঁচকপালী চিড়ল দাঁতি পিঙ্গল কেশ
ঘুরবে কন্যা নানান দেশ।"

—খনা

"আছে ভিসা, সঙ্গে ক্যাশ
ঘুরবে পুরুষ নানান দেশ।"

—হুমায়ূন আহমেদ

মহান চীন এবং কিছু ড্রাগন

বিশেষ এক ধরনের জটিল ব্যাধি আছে যা শুধুমাত্র লেখকদের আক্রমণ করে। লেখকরা তাদের লেখালেখি জীবনে কয়েকবার এই ব্যাধিতে ধরাশায়ী হন। পৃথিবীতে এমন কোনো লেখক পাওয়া যাবে না— যিনি জীবনে একবারও এই জটিল অসুখের শিকার হন নি। মেটেরিয়া মেডিকায় এই অসুখের বিবরণ থাকা উচিত ছিল কিন্তু নেই। লেখকদের নিয়ে কে ভাবে?

যাই হোক, অসুখটার ইংরেজি নাম 'Writer's Block', বাংলায় 'লেখক বন্ধ্যা রোগ' বলা যেতে পারে। এই রোগের লক্ষণ এরকম— হঠাৎ কোনো একদিন লেখকের মাথা শূন্য হয়ে যায়। তিনি লিখতে পারেন না। গল্প-কবিতা দূরে থাকুক, স্বরে 'অ' স্বরে 'আ'-ও না। তিনি অভ্যাসমতো রোজ কাগজ-কলম নিয়ে বসেন এবং কাগজের ধবধবে শাদা পাতার কোনায় কোনায় ফুল-লতাপাতা আঁকার চেষ্টা করেন। কাপের পর কাপ চা ও সিগারেট খান। একসময় উঠে পড়েন। এটা হচ্ছে রোগের প্রাথমিক পর্যায়।

রোগের দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখক ইনসমনিয়ায় আক্রান্ত হন। সারা রাত জেগে থাকেন। মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়। অকারণে রাগারাগি করতে থাকেন— যেমন, 'চা এত গরম কেন?' [চা গরম হবারই কথা। লেখক আইস

টি খেতে চাইলে ভিন্ন কথা।] 'সবাই উঁচু গলায় কথা বলছে কেন ?' [সবাই স্বাভাবিক গলাতেই কথা বলছে। এরচে' নিচু গলায় কথা বললে কানাকানি করতে হয়।] 'এই গ্লাসে করে আমাকে পানি কেন দেয়া হলো ?' [লেখক জীবনে কখনো কোন গ্লাসে পানি দেয়া হয়েছে তা নিয়ে মাথা ঘামান নি। ব্যাধিগ্রস্ত হবার পর গ্লাস নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন। কী রকম গ্লাসে পানি দেয়া হলে তিনি খুশি হবেন তাও কিন্তু খোলসা করে বলছেন না।]

রোগের শেষ পর্যায়ে লেখক ঘোষণা করেন, তিনি আর লেখালেখি করবেন না। অনেক হয়েছে। '... ছাল' লিখে ফায়দা নেই। [ছালের আগের শব্দটা বুদ্ধিমান পাঠক গবেষণা করে বের করে নিন।] লেখকের মুখের ভাষা বস্তি লেভেলে নেমে আসে। তাঁর মধ্যে কাজী নজরুল সিনড্রম দেখা যায়। হাতের কাছে যাই পান তাই ছিঁড়ে ফেলেন। নিজের পুরনো লেখা, টেলিফোন বিল, ইলেকট্রিসিটি বিল সব শেষ। তারপর এক অনিদ্রার মধ্যরাতে স্ত্রীকে ডেকে তুলে শান্ত গলায় বলেন, আমি বেঁচে থাকার কোনো অর্থ খুঁজে পাচ্ছি না। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি সুইসাইড করব। তোমার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে তোমার কাঁচাঘুম ভাঙিয়েছি। তার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী। এখন দয়া করে একুশটা ঘুমের ওষুধ আমাকে দাও আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি।

কোনো কোনো পাঠক হয়তো ভাবছেন আমি Writer's Block নামক রোগটা নিয়ে রসিকতা করছি। তাঁদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি, এই পৃথিবীর অনেক লেখক (খ্যাত এবং অখ্যাত) এই ভয়াবহ অসুখের শেষ পর্যায়ে এসে আত্মহত্যা করেছেন। এই মুহূর্তে যাঁদের নাম মনে পড়ছে তাঁরা হলেন—

কবি মায়াকোভস্কি (রাশিয়া)
ঔপন্যাসিক হেমিংওয়ে (নোবেল প্রাইজ বিজয়ী, আমেরিকান)
ঔপন্যাসিক কাওয়াবাতা (নোবেল প্রাইজ বিজয়ী, জাপানি)
কবি জীবনানন্দ দাশ (বাংলাদেশ)

বিখ্যাতদের মতো অতি অখ্যাতরাও যে এই রোগে আক্রান্ত হতে পারেন তার উদাহরণ আমি। গত শীতের মাঝামাঝি সময়ে হঠাৎ আমাকে এই রোগে ধরল। কঠিনভাবেই ধরল। এক গভীর রাতে শাওনকে ডেকে তুলে বললাম, 'কোথা সে ছায়া সখি কোথা সে জল ? কোথা সে বাঁধাঘাট অশ্বত্থতল ?' সে হতভম্ব হয়ে বলল, এর মানে ?

আমি বললাম, তুমি খুব আগ্রহ করে একজন লেখককে বিয়ে করেছিলে। সেই লেখক কিছু লিখতে পারছেন না। কোনোদিন পারবেনও না। আমি ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। লেখকের সঙ্গে জীবনযাপনের আগ্রহ তারপরেও যদি তোমার থাকে, তুমি অন্য লেখক খুঁজে বের কর। আমি শেষ। আসসালামু আলায়কুম।

জীবন সংহারক রাইটার্স ব্লকের কোনো ওষুধ নেই। এন্টিবায়োটিক বা সালফা ড্রাগ কাজ করে না, তবে সিমটোমেটিক চিকিৎসার বিধান আছে। সিমটোমেটিক চিকিৎসায় লেখককে অতি দ্রুত তিনি যে পরিবেশে বাস করেন সেখান থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে। তাঁর প্রিয়জনরা সবাই তাঁর আশেপাশে থাকবেন, তবে লেখালেখি বিষয়ে কেউ তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারবেন না। লেখকের সঙ্গে কোনো বিষয়েই কেউ তর্কে যাবেন না। তিনি যা বলবেন সবাই 'গোপাল বড়ই সুবোধ বালকে'র মতো তাতে সায় দেবে।

হুমায়ূন আহমেদ ও শাওন

আমার লেখক ব্লক দূর করার ব্যবস্থা হলো। প্রধান উদযোগী অন্যপ্রকাশের মাজহার। আমার এই অসুখে সে-ই সবচে' ক্ষতিগ্রস্ত। আমি বই না লিখলে সে ছাপবে কী? সামনেই একুশের বইমেলা।

মাজহার এক সকালবেলা অনেক ভণিতার শেষে বলল, আমি জানি আপনি দেশের বাইরে যেতে চান না। চলুন না ঘুরে আসি। আপনি লেখালেখি করতে পারছেন না— এটা কোনো ব্যাপার না। সারাজীবন লেখালেখি করতে হবে তাও তো না। এক জীবনে যা লিখেছেন যথেষ্ট। এমনি একটু ঘুরে আসা। আপনি হ্যাঁ বললে খুশি হবো।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

আনন্দে মাজহারের কালো মুখ বেগুনি হয়ে গেল। হিসাব মতো তার মুখে বত্রিশটা দাঁত থাকার কথা, সে কীভাবে যেন চল্লিশটা দাঁত বের করে হেসে ফেলল।

হুমায়ূন ভাই, কোথায় যেতে চান বলুন— ইন্দোনেশিয়ার বালি, মালয়েশিয়ার জেনটিং, থাইল্যান্ডের পাতায়া/ফুকেট, মরিশাস, মালদ্বীপ।

আমি বললাম, ড্রাগন দেখতে ইচ্ছা করছে। চীনে যাব।

মাজহারের মুখের ঔজ্জ্বল্য সামান্য কমল। সে আমতা আমতা করে বলল, চীনে এখন ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা। টেম্পারেচার শূন্যেরও নিচে...

আমি আগের চেয়েও গম্ভীর গলায় বললাম, চীন।

মাজহারের মনে পড়ল রাইটার্স ব্লকের রোগীর সব কথায় সায় দিতে হয়। সে বলল, অবশ্যই চীন। আমরা গরম দেশের মানুষ। ঠাণ্ডা কী জানি না। হাভে কলমে ঠাণ্ডা শেখার মধ্যেও মজা আছে।

হঠাৎ করে আমার মাথায় চীন কেন এলো বুঝতে পারলাম না। এমন না যে আমি চীন দেখি নি। পনেরো বছর আগে একবার গিয়েছিলাম। প্রায় একমাস ছিলাম। চীন দেশের নানান অঞ্চলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেই দেশে আরেকবার না গিয়ে অন্য কোথাও যাওয়া যেত। কিন্তু আমার মাথায় বাচ্চাদের মতো ঘুরছে— চীন, চীনের ড্রাগন।

সফরসঙ্গীর দীর্ঘ তালিকা তৈরি হলো। রাইটার্স ব্লক ব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীকে একা ছাড়া যাবে না। তার চারপাশে বন্ধুবান্ধব থাকতে হবে।

আমার সফরসঙ্গীরা হলেন—

০১. চ্যালেঞ্জার এবং চ্যালেঞ্জার-পত্নী।

চ্যালেঞ্জার একজন অভিনেতা। বেচারা একদিন দুহাশ চলচ্চিত্রে নাটকের শুটিং দেখতে এসেছিল। নাপিতের এক চরিত্রে কাউকে অভিনয় করার জন্যে পাচ্ছিলাম না। তাকে ধমক দিয়ে জোর করে নামিয়ে দিলাম। আজ সে বিখ্যাত অভিনেতা। শুনেছি বাংলাদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে তার সম্মানী সর্বোচ্চ। চ্যালেঞ্জার-পত্নী স্কুল শিক্ষিকা। স্বামীর প্রতিভায় তেমন মুগ্ধ না, তবে স্বামীর নানাবিধ যন্ত্রণায় কাতর।

০২. কমল, কমল-পত্নী এবং কন্যা আরিয়ানা।

কমলও আমার নাটকের অভিনেতা। ডায়ালগ ছাড়া অভিনয়ে সে অতি পারঙ্গম। ডায়ালগ দিলেই নানা সমস্যা। তোতলামি, মুখের চামড়া শক্ত হয়ে যাওয়া, হাত-পা বেঁকে যাওয়া শুরু হয়। সে আমার নাটকে অতি দক্ষতার সঙ্গে, রাইফেল কাঁধে মুক্তিযোদ্ধা, পাকিস্তান আর্মির সেপাই, পথচারী, দুর্ভিক্ষে

চ্যালেঞ্জার এবং চ্যালেঞ্জার পত্নী

কমল, কমল পত্নী এবং কন্যা আরিয়ানা

মৃত লাশের ভূমিকা করেছে। এই মহান অভিনেতা অভিনয়ের জন্যে কোনো সম্মানি দাবি করেন না। ডেডবডির ভূমিকায় তিনি অনবদ্য। ডেডবডির ভূমিকায় এক বটগাছের নিচে তিনি আড়াই ঘণ্টা হা করে পড়ে ছিলেন। এর মধ্যে মুখে পিঁপড়া ঢুকেছে, কামড় দিয়ে তাঁর জিহ্বা ফুলিয়ে ফেলেছে, তিনি নড়েন নি। কমল পত্নীর নাম লিজনা। একসময় স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। অভিনেতা স্বামীর পেছনে সময় দিতে গিয়ে স্কুল ছেড়েছেন। এখন তাঁর প্রধান কাজ অভিনেতা স্বামীর কস্টিউম গুছিয়ে দেয়া। এই দম্পতির একমাত্র কন্যা আরিয়ানার বয়স চার। পরীশিশুর চেয়েও সুন্দর। পুরো চায়না ট্রিপে আমার অনেকবারই ইচ্ছা করেছে, মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করি। নিজের ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য কোনো ছেলেমেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করার আমার অভ্যাস নেই বলে করা হয় নি।

০৩. মাজহার, মাজহার-পত্নী, তাদের শিশুপুত্র অমিয় এবং টমিও।

মাজহারের একটি পরিচয় আগেই দিয়েছি, তারচেয়ে বড় পরিচয় সেও আমার নাটকের একজন অভিনেতা। তার এক মিনিটের একটি দৃশ্য আমি পুরো একদিন শুট করার পর ফেলে দিয়ে বাসায় চলে আসি। পরের দিন আমার হয়ে

শাওন সেই দৃশ্য শুট করতে যায়। আমি নিশ্চিত ছিলাম সে পারবে। সে আমার মতো অধৈর্য না। তার ধৈর্য বেশি। সে এক মিনিটের এই দৃশ্য শুট করতে দেড় দিন সময় নেয়। শুটিং শেষে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে বাসায় ফিরে আসে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাজহার কেমন করেছে? সে ঝড়ঝড়ে গলায় বলেছে, তুমি জানো না সে কেমন করেছে? সব বন্ধু-বান্ধবকেই অভিনেতা বানাতে হবে?

আমি এখনো আশাবাদী। কারণ আমার চিফ অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর (জুয়েল রানা) আমাকে বলেছে যে, মাজহার স্যারের না-সূচক মাথা নাড়া এবং হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়া খারাপ হয় নি। প্রায় ন্যাচারাল মনে হয়েছে।

মাজহার-পত্নী স্বর্ণা সিলেটের মেয়ে। মা স্বভাবের মেয়ে। মাতৃভাব অত্যন্ত প্রবল। দীর্ঘদিন ধরে তাকে চিনি। তার মুখ থেকে এখনো কারো প্রসঙ্গে একটি মন্দ কথা শুনি নি। স্বর্ণা স্বামীর অভিনয় প্রতিভায় মুগ্ধ। স্বামীর প্রথম অভিনয়ের দিন সে মানতের রোজা রেখেছে। শাহজালাল সাহেবের দরগায় বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করেছে।

এই দম্পতির একমাত্র পুত্রসন্তান অমিয়। নামটা রেখেছেন অভিনেতা আসাদুজ্জামান নূর। মাজহার পুত্রের নামের জন্যে আমার কাছে প্রথম এসেছিল।

মাজহার, মাজহার-পত্নী এবং শিশুপুত্র অমিয়

আমি নাম রেখেছিলাম— অরণ্য। মাজহার এই নাম রাখে নি, কারণ এই নামের একটা বাচ্চাকে সে চেনে। সেই বাচ্চা খুবই দুষ্ট প্রকৃতির। অরণ্য নাম রাখলে বাচ্চা বন্যস্বভাবের হয়ে যেতে পারে।

'যে যার নিন্দে তার দুয়ারে বসে কান্দে'। আমাদের অমিয় (বয়স চার) মাশাল্লাহ অতি দুষ্ট প্রকৃতির হয়েছে। তার সঙ্গে খেলতে এসে তার হাতে মার খায় নি এমন কোনো শিশু নেই। কামড় দিয়ে রক্ত বের করার বিষয়েও সে ভালো দক্ষতা দেখাচ্ছে। এই দিকে সে আরো উন্নতি করবে বলে সবারই বিশ্বাস। বেইজিং-এর ম্যাগডোনাল্ড রেস্টুরেন্টে বার্গার খাওয়ার সময় সে ফ্লাইং কিক দিয়ে দুই চায়নিজ বাচ্চাকে একই সঙ্গে ধরাশায়ী করে রেস্টুরেন্টের সবার প্রশংসাসূচক দৃষ্টি লাভ করেছে।

তার বিষয়ে একটি গল্প এখনই বলে নেই, পরে ভুলে যাব।

আমি কোনো একটা পত্রিকায় ইন্টারভ্যু দিচ্ছি। বিষয়বস্তু 'বাংলাদেশের ছোটগল্পের ভবিষ্যৎ'। অতি জটিল বিষয়। যিনি ইন্টারভ্যু নিচ্ছেন তিনি কঠিন কঠিন সব প্রশ্ন করছেন, যার উত্তর আমি জানি না। মোটামুটি অসহায় বোধ করছি। আমার পাশে নিরীহ মুখ করে অমিয় বসে আছে। তাকে দেখে মনে হচ্ছে সে ইন্টারভ্যু নামক বিষয়টাতে যথেষ্ট মজা পাচ্ছে। প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন একটু বলুন, বাংলাদেশের কোন কোন গল্পকার কাফকাকে অনুসরণ করেন?'

উত্তরের জন্যে আমি আকাশ-পাতাল হাতড়াচ্ছি, এমন সময় আমার গালে প্রচণ্ড এক চড়। আমার প্রায় পড়ে যাবার মতো অবস্থা। প্রথমে ভাবলাম— প্রশ্নকর্তা আমার মূর্খতায় বিরক্ত হয়ে চড় লাগিয়েছেন। ধাতস্থ হয়ে বুঝলাম প্রশ্নকর্তা না, চড় দিয়েছে অমিয়। আমি উত্তর দিতে দেরি করায় সে হয়তো বিরক্ত হয়েছে। প্রশ্নকর্তা ভীত গলায় বলল, স্যার, এই ছেলে কে?

আমি বললাম, অন্যদিন পত্রিকার সম্পাদক মাজহারুল ইসলামের ছেলে। সে বলল, আপনাকে মারল কেন?

আমি বললাম, ছেলে তার বাবার মতো হয়েছে। সাহিত্য পছন্দ করে না। সাহিত্য বিষয়ক কোনো আলোচনাও পছন্দ করে না। ইন্টারভ্যু এই পর্যন্ত থাক।

জ্বি আচ্ছা থাক।

এত সহজে প্রশ্নকর্তা যে তার ইন্টারভ্যু বন্ধ করল তার আরেকটি কারণ— ইতিমধ্যে অমিয় প্রশ্নকর্তার ক্যামেরার উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে। ক্যামেরা নিয়ে দু'জনের দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে।

অমিয়'র চড় খেয়ে আমি তেমন কিছু মনে করি নি। তার কারণ সে আমাকে ডাকে— বুব বু। বুব বু'র অর্থ বন্ধু। বন্ধু বলতে পারে না, বলে বুব বু। একজন বন্ধু আরেক বন্ধুর গালে চড়-থাপ্পড় মারতেই পারে।

ও আচ্ছা টমিওর কথা বলা হয় নি। অমিয়র ভাই টমিও মায়ের পেটে। তার এখনো জন্ম হয় নি। সে মায়ের পেটে করে বেড়াতে যাচ্ছে।

০৪. স্বাধীন খসরু। অভিনেতা।

সে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে না। কারণ সে আছে ইংল্যান্ডে। তার সঙ্গে কথা হয়েছে, সে সরাসরি ইংল্যান্ড থেকে বেইজিং-এ চলে আসবে। সে অভিনয় শিখেছে লন্ডন স্কুল অব ড্রামা থেকে। যে স্কুল পৃথিবীর অনেক বড় বড় অভিনেতার জন্ম দিয়েছে। উদাহরণ— এলিজাবেথ টেলর, পিটার ও টুল...। সে ইংল্যান্ডের সব ছেড়ে-ছুড়ে বাংলাদেশে চলে এসেছে শুধুমাত্র অভিনয়ের আকর্ষণে। আমার সব নাটকেই তাকে দেখা যায়। সে নাম করেছে 'তারা তিনজন'-এর একজন হিসেবে। দেশের বাইরে তার জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। তাকে নিয়ে একবার আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে গিয়েছিলাম। বাঙালি সমাজ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আনন্দময় দৃশ্য। ছেলে হিসেবে সে অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণ। অতি তুচ্ছ কারণে সে ভেউ ভেউ করে কাঁদছে— এটি নিত্যদিনকার দৃশ্য। তার গত জন্মদিনে আমরা তাকে নরসিংদীর বিশাল এক গামছা উপহার দিয়েছি। উপহারপত্রে লেখা— 'পবিত্র অশ্রুজল মোছার জন্যে'।

০৫. শাওন ও লীলাবতী।

শাওনকে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছু নেই। তার প্রভাতেই সে দীপ্ত। হুমায়ূন আহমেদের দ্বিতীয় স্ত্রী পরিচয় অবশ্যই তার জন্যে সুখকর না। লীলাবতীর পরিচয় দেয়া প্রয়োজন। লীলাবতী তার গর্ভে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকা কন্যা। গত পাঁচ মাস ধরে সে মায়ের পেটের অন্ধকারে বড় হচ্ছে। মা'র সঙ্গে সেও চীনে যাচ্ছে। তার ভ্রমণ অতি আনন্দময়। সে বাস করছে পৃথিবীর সবচে' সুরক্ষিত ঘরে। সে ঘর অন্ধকার হলেও মায়ের ভালোবাসায় আলোকিত।

অভিনেতা স্বাধীন খসরু

হুমায়ূন আহমেদের একমাত্র পুত্র নুহাশ

ভ্রমণ বিষয়ে শাওনের উৎসাহ সীমাহীন। যেখানে ঘরের বাইরে পা ফেলতে পারলেই সে খুশি, সেখানে সে যাচ্ছে চীনে! মিং ডায়ানেস্টির সভ্যতা দেখবে, চীনের প্রাচীর দেখবে।

দেশের ভেতর সে আমাকে নিয়ে ঘুরতে পারে না। প্রধান কারণ দোকানে দোকানে জিনিসপত্র দেখে বেড়ানো আমার স্বভাব না। রেস্টুরেন্টে রেস্টুরেন্টে খাওয়া-দাওয়া আমার অপছন্দ। তারপরেও কোথাও কোথাও যাওয়া হয়। লোকজন তখন যে তার দিকে মায়া মায়া দৃষ্টিতে তাকায় তা-না। লোকজনের দৃষ্টিতে থাকে— হুমায়ূন আহমেদ নামক ভালো মানুষ লেখককে কুহক মায়ায় তুমি মুগ্ধ করেছ। তুমি কুহকিনী!

দেশের বাইরে তার সেই সমস্যা নেই। আমাকে পাশে নিয়ে কোনো রেস্টুরেন্টে খেতে বসলে কেউ সেই বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাবে না। দু'একজন হয়তো ভাববে— বাচ্চা একটা মেয়ে বুড়োটার সঙ্গে বসে আছে কেন? এর বেশি কিছু না। এ ধরনের দৃষ্টিতে শাওনের কিছু যায় আসে না।

দেশের বাইরে শাওনের ঝলমলে আনন্দময় মুখ দেখতে আমার ভালো লাগে। তবে মাঝেমধ্যে একটা বিষয় চিন্তা করে বুকের মধ্যে ধাক্কার মতো লাগে। আমি ষাট বছরের বুড়ি ধরতে যাচ্ছি। চলে যাবার ঘণ্টা বেজে গেছে। আমার মৃত্যুর পরেও এই মেয়ে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকবে। সে কি একাকী নিঃসঙ্গ

জীবন কাটাবে? না-কি আনন্দময় অন্য কোনো পুরুষ আসবে তার পাশে। সে কোনো এক রেস্টুরেন্টে মাথা দুলিয়ে হেসে হেসে গল্প করবে তার সঙ্গে— 'এই কী হয়েছে শোন, আমি যখন ছোট ছিলাম তখন না...'

০৬. পুত্র নুহাশ।

না না, সে আমাদের সঙ্গী না। শাওন যেখানে আছে সেখানে সে যাবে কিংবা তাকে যেতে দেয়া হবে তা হয় না।

নুহাশকে আমার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ দেখা করতে দেয়া হয়। তবে আমার ঘরে ঢোকার অনুমতি দেয়া হয় না। সে আসে, গ্যারেজে দাঁড়িয়ে মোবাইলে এসএমএস করে জানায়— 'বাবা আমি এসেছি।' আমি নিচে নেমে যাই। গাড়িতে কিছুক্ষণ এলোমেলোভাবে ঘুরি। মাঝে মধ্যে মাথায় হাত রাখি। সে লজ্জা পায় বলেই চট করে হাত সরিয়ে নেই। তাকে বাসায় নামিয়ে মন খারাপ করে ফিরে আসি।

যে পুত্র সঙ্গে যাচ্ছে না তার নাম সফরসঙ্গী হিসেবে কেন লিখলাম? এই কাজটা লেখকরা পারেন। কল্পনায় অনেক সঙ্গী তারা সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে পারেন।

দীর্ঘ চীন ভ্রমণে অদৃশ্য মানব হয়ে আমার পুত্র আমার সঙ্গে ছিল। একবার ফরবিডেন সিটিতে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে পড়লাম। কমল কমলের মেয়েকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল, মাজহার তার ছেলেকে নিয়ে। আমি শাওনকে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছি। তার পেটে লীলাবতী। পা পিছলে পড়লে বিরাট সমস্যা। হঠাৎ দেখি একটু দূর দিয়ে মাথা নিচু করে নুহাশ হাঁটছে। তার মুখ বিষণ্ন। চোখ আর্দ্র। আমি বললাম, বাবা, আমার হাত ধর। আমার দায়িত্ব শাওনকে হাত ধরে ঠিকমতো নিয়ে যাওয়া। তোমার দায়িত্ব আমাকে ঠিকমতো নিয়ে যাওয়া। সে এসে আমার হাত ধরল।

কল্পনার নুহাশ বলেই করল। লেখকরা তাদের কল্পনার চরিত্রদের নিয়ে অনেক কিছু করিয়ে নেন। লেখক হবার মজা এইখানেই।

প্রথম রজনী...

ঢাকা থেকে হংকং। হংকং থেকে বেইজিং।

প্লেন থেকে নামলাম। এয়ারপোর্টের টার্মিনাল থেকে বের হলাম, একসঙ্গে সবার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল। মেয়েদের লম্বা চুল বলেই খাড়া হলো না, ফুলে ফুলে গেল। কারণ সহজ। তাপমাত্রা শূন্যের সাত ডিগ্রি নিচে। হাওয়া বইছে। টেম্পারেচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে চিল ফ্যাক্টর। চিল ফ্যাক্টরের কারণে

হোটেল লবিতে খুদে দুই সফরসঙ্গী আরিয়ানা-অমিয়, পেছনে ক্রিসমাস ট্রি।

তাপমাত্রা শূন্যের আঠারো-উনিশ ডিগ্রি নিচে চলে যাবার কথা। এই হিসাব কেমন করে করা হয় আগে জানতাম। এখন ভুলে গেছি।

কমল বলল, হুমায়ূন ভাই, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব আছে।

আমি বললাম, হুঁ।

শুধু মেয়েরা খুশি। বেড়াতে বের হলে সব কিছুতেই তারা আনন্দ পায়। বড়ই আহ্লাদী হয়।

শাওন বলল, ঠাণ্ডাটা যা মজা লাগছে!

বাকিরাও তার সঙ্গে গলা মেলাল। তাদেরও নাকি মজা লাগছে। তারা সিগারেট খেলা শুরু করল। সিগারেট খাওয়ার ভঙ্গি করে ধোঁয়া ফেলে। সঙ্গে সঙ্গে নিঃশ্বাসের জলীয় বাষ্প জমে যায়। মনে হয়, বুনকা বুনকা ধোঁয়া।

বাচ্চারা সবার আগে কাহিল হলো। কারোর হাত-মোজা নেই। ঠাণ্ডায় হাত শক্ত হয়ে গেল। তারা শুরু করল কান্না। কে তাকায় বাচ্চাদের দিকে? বাচ্চাদের মায়েদের ঠাণ্ডা নিয়ে আহ্লাদী তখনো শেষ হয় নি।

বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি অ্যাম্বেসির গাড়ি নিয়ে এসেছেন। তাঁর নাম মনিরুল হক। তিনি আমাদের হয়ে হোটেল বুকিংও দিয়ে রেখেছেন। তাঁর দায়িত্ব আমাদেরকে হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া। এক গাড়িতে হবে না। আরো কয়েকটা গাড়ি লাগবে। তিনি ব্যস্ত হয়ে চলে গেছেন গাড়ির সন্ধানে। আমরা দুর্দান্ত শীতে থরথর করে কাঁপছি।

অ্যাম্বেসির বিষয়টা বলি। একজন লেখক বন্ধুবান্ধব নিয়ে বেড়াতে যাবে, তার জন্যে অ্যাম্বেসি গাড়ি পাঠাবে— বাংলাদেশ অ্যাম্বেসি এই জিনিস না। লেখক কবি-সাহিত্যিক-পেইন্টার তাদের কাছে কোনো বিষয় না। প্রবাসে যেসব বাংলাদেশী বাস করেন, তারাও তাদের কাছে কোনো বিষয় না। অ্যাম্বেসি দেখে বেড়াতে আসা মন্ত্রী-মিনিস্টারদের, আমলাদের। সেইসব মহামানবরা অ্যাম্বেসির গাড়ি নিয়ে শপিং করেন। অ্যাম্বেসির কর্মকর্তারা বাজারসদাই-এ সহায়তা করেন।

পৃথিবীর বাকি দেশগুলির অ্যাম্বেসির অনেক কর্মকাণ্ডের প্রধান কর্মকাণ্ড, তাদের সংস্কৃতির সঙ্গে অন্যদের পরিচয় করিয়ে দেয়া। এত সময় বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির কর্মকর্তাদের নেই। তাদেরকে নানান স্টেট ফাংশানে ডিনার খেতে হয়। অনেকগুলি পত্রিকা পড়তে হয় (দেশে কী হচ্ছে জানার জন্যে।) সময়ের বড়ই অভাব।

আমি কখনো দেশের বাইরে গেলে অ্যাম্বেসির সঙ্গে যোগাযোগ করে যাই না। আমার কাছে অর্থহীন মনে হয়। বেইজিং-এ অ্যাম্বেসিকে আগেভাগে জানানোর কাজটি করেছে মাজহার। যে ভদ্রলোক অ্যাম্বেসি থেকে এসেছেন তিনি যে অ্যাম্বাসেডর কর্তৃক নির্দেশ পেয়ে এসেছেন তাও না। তিনি এসেছেন, নিজের আগ্রহে এবং আনন্দে। তিনি লেখক হুমায়ূন আহমেদের অনেক বই পড়েছেন, অনেক নাটক দেখেছেন। লেখককে সামনাসামনি দেখার ইচ্ছাই তাঁর মধ্যে কাজ করেছে।

গ্লোরিয়া প্লাজা হোটেল, বেইজিং

এই সৌভাগ্য আমার প্রায়ই হয়। অ্যাম্বেসিতে সিরিয়াস কিছু ও পাওয়া যায়। তারা যে

আগ্রহ দেখায় তার জন্যেও সমস্যায় পড়তে হয়। ১৯৯৬ সালে বিশাল এক দল নিয়ে নেপালের কাঠমাণ্ডুতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। অ্যাম্বেসিতে মোটামুটি হুলস্থুল পড়ে গেল। অ্যাম্বেসি তিনটি ডিনার দিল। কাঠমাণ্ডুর লেখক-শিল্পীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ব্যবস্থা করল। আমি বিব্রত (এবং খানিকটা আনন্দিতও)। সমস্যা দেখা দিল তারপর যখন বাংলাদেশ অ্যাম্বেসি আমার এবং আমার দলের পেছনে বিরাট অঙ্কের খরচ দেখাল। খরচের হিসাব চলে গেল জাতীয় সংসদে। শাওনের মা, বেগম তহুরা আলি তখন সংসদ সদস্য। তাঁর কাছেই সংসদের আলোচনার কথা শুনলাম। খুবই লজ্জা পেলাম।

কাজেই আমি অ্যাম্বেসির তরুণ সুদর্শন হাস্যমুখি ফার্স্ট সেক্রেটারিকে শক্তভাবে বললাম, আপনি যে কষ্ট করেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। তবে আপনার কাছ থেকে আর কোনো সাহায্য-সহযোগিতা আমি নেব না। আপনাদের কারো বাড়িতে ডিনার খাব না, অ্যাম্বাসেডর সাহেবের সঙ্গে দেখা করব না।

মনিরুল হক অতি বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনি যা বলবেন তাই।

মনিরুল হক তাঁর কথা রাখেন নি। তিনি তাঁর বাড়িতে বিশাল খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলেন। সেখানে আমাদের অ্যাম্বাসেডরও উপস্থিত ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ, পৃথিবীর সংস্কৃতি চর্চা, ধর্ম নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ (এবং শিক্ষণীয়) বিষয়ে আলোচনা করলেন। এই আলোচনায় আমার সফরসঙ্গীরা উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয়। কারণ তারা গভীর আগ্রহে আলোচনা শুনল।

হোটেল কক্ষে কমল-পত্নী লিজনা, মাজহার, মাজহার-পত্নী স্বর্ণা ও শাওন। মেয়েরা হাস্যমুখি পুরুষ [illegible]।

দেশে ফেরার সময় মনিরুল হক সাহেব কাচুমাচু হয়ে একটা প্রস্তাব দিলেন। অ্যাম্বাসেডর সাহেব ফরেন সেক্রেটারির জন্য উপহার হিসেবে একটা গলফ সেট পাঠাবেন। গলফ সেটটা অত্যন্ত দামি বিধায় লাগেজে দেয়া যাচ্ছে না। হাতে করে নিয়ে যেতে হবে। আমরা কি নিয়ে যাব ? একবার ঢাকায় পৌছলে আমাদের আর কিছুই করতে হবে না। সেক্রেটারি সাহেব লোক পাঠিয়ে নিয়ে যাবেন।

আমি গলফ সেট কাঁধে করে নিয়ে যেতে খুবই রাজি ছিলাম। আমার সফরসঙ্গীরা বাদ সাধল। তারা মনে করল, এতে লেখক হুমায়ূন আহমেদের সম্মানহানি হবে। গলফ সেট নেয়া হলো না।

আমাদের পররাষ্ট্র সচিবের কাছে এতদিনে নিশ্চয়ই গলফ সেট পৌঁছে গেছে। আশা করি, গলফে তাঁর যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আমরা মন্ত্রী, সচিব এবং অ্যাম্বাসেডরদের সর্ব বিষয়ে উন্নতি কামনা করি।

বেইজিং-এ আমাদের জন্যে যে হোটেল ঠিক করা ছিল, তার নাম Gloria Plaza. চমৎকার হোটেল। সামনেই ক্রিসমাস, এই উপলক্ষে সুন্দর করে সাজানো। বাইরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, ভেতরে চমৎকার উষ্ণতা। ডেস্কের চায়নিজ মেয়েরা সুন্দর ইংরেজি বলছে। ব্যবহার আন্তরিক। এক যুগ আগের দেখা চীন এবং বর্তমানের আধুনিক চীনের কোনো মিল নেই।

আমাদের হোটেলে দাখিল করে মনিরুল হক সাহেব কয়েকটা টিপস দিলেন। প্রথম টিপস, কেনাকাটা করতে গেলেই দামাদামি করতে হবে। এখানকার দোকানপাট ইউরোপ-আমেরিকার মতো না— যে দাম লেখা থাকবে সেই দামেই সোনামুখ করে কিনতে হবে। চায়নিজ দোকানিরা জিনিসপত্রের গায়ে আকাশছোঁয়া দাম লিখে রাখে, কাজেই শুরু করতে হবে পাতাল থেকে। যে বস্তুর গায়ে লেখা পাঁচশ' ইয়েন, তার দাম বলতে হবে পাঁচ ইয়েন। কিছুক্ষণ দরদাম করার পর দশ ইয়েনে ঐ বস্তু পেয়ে যাওয়ার কথা।

মেয়েরা আসন্ন দরদামের কথা ভেবে আনন্দে অধীর হয়ে গেল। এই কাজটি মেয়েরা কেন জানি না খুবই আগ্রহের সঙ্গে করে। চারঘণ্টা সময় নষ্ট করে তারা একশ' টাকার জিনিস ৯৫ টাকায় কিনে এমন ভাব করবে যেন তারা চেঙ্গিস খান, এইমাত্র এক রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেছে। চারঘণ্টা তাদের কাছে কোনো বিষয় না, পাঁচ টাকা বিষয়।

আমি নিজে নিউ মার্কেট কাঁচা বাজারে এক অতি বিত্তবান তরুণীকে পেঁপের দাম দু'টাকা কমানোর জন্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দরদাম করতে দেখেছি। বিত্তবান

তরুণীর পরিচয় দিলে আপনারা কেউ কেউ চিনতেও পারেন। তাঁর নাম মেহের আফরোজ শাওন। তিনি ফিল্মে অভিনয় করেন এবং গান করেন।

মনিরুল হক সাহেবের দ্বিতীয় টিপস হলো— এখানে সবকিছুর দু'টা নাম। একটা ইংরেজি নাম, একটা চায়নিজ নাম। হোটেল Gloria Plaza-র একটা চায়নিজ নাম আছে। চায়নিজ নাম জানা না থাকলে মহাবিপদ। কোনো ট্যাক্সি ড্রাইভারই ইংরেজি নাম জানে না। মনিরুল হক সাহেবের এই উপদেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা না করায় আমি যে বিপদে পড়েছিলাম যথাসময়ে তা বর্ণনা করা হবে।

হোটেলের রুমগুলি সবার পছন্দ হলো। শুধু মাজহারের হলো না। তার ধারণা, তার নিজের রুম ছাড়া বাকি সবগুলো ভালো।

অনেক ঝামেলা করে সে তার রুম পাল্টালো। রাতে সবাইকে নিয়ে খেতে যাব, তখন শুনি বর্তমান রুমটাও মাজহার বদলাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ এই রুমের সবই ভালো, শুধু কমোডের ঢাকনিটায় কালো কালো দাগ।

রাত এগারোটায় দ্বিতীয় দফা রুম বদলানোর পর আমরা খাদ্যের সন্ধানে বের হলাম। কাছেই ম্যাকডোনাল্ড। বার্গার খাওয়া হবে। মেয়েদের মধ্যে আবারো আনন্দের ঝড় বয়ে গেল। আচ্ছা, মেয়েরা সবসময় জাংক বস্তু পছন্দ করে কেন? জাংক ফুড, জাংক স্বামী। একজন ভালোমানুষ স্বামীকে মেয়েরা যত পছন্দ করে, তারচেয়ে দশগুণ বেশি পছন্দ করে জাংক স্বামী। এই জন্যেই কি নারী চরিত্র 'দেবা না জানন্তি, কুতোপি মনুষ্যা'?

শুকনা বার্গার চিবুতে চিবুতে দুঃসংবাদ শুনলাম। হোটেল গ্লোরিয়া প্লাজার নাশতা বিষয়ক দুঃসংবাদ। প্রতি রুমের একজন ফ্রি নাশতা খাবে। অন্যজনকে কিনে খেতে হবে। আমি বলতে গেলে পৃথিবীর সব দেশেই গেছি— এমন অদ্ভুত নিয়ম দেখি নি এবং কারো কাছ থেকে শুনিও নি।

রাতেই দলগতভাবে সিদ্ধান্ত হলো, সকালবেলা প্রতি রুমের স্বামী বেচারা নাশতা খেতে যাবে, তার দায়িত্ব হবে স্ত্রীর নাশতা লুকিয়ে নিয়ে আসা। সেদ্ধ ডিম, রুটি, মাখন, জ্যাম পকেটে ঢুকিয়ে ফেলা কোনো ব্যাপারই না। পরের দিন স্ত্রীদের পালা, তারা স্বামীদের নাশতা নিয়ে আসবে। দারুণ উত্তেজনাপূর্ণ চুরি চুরি খেলার কথা ভেবে আনন্দে সবাই আত্মহারা। আমি ক্ষীণ স্বরে আপত্তি করতে গিয়ে ধমক খেলাম। ব্যাপারটায় নাকি প্রচুর ফান আছে। আমি মাথামোটা বলে ফানটা ধরতে পারছি না। খাবার চুরি এবং বই চুরিতে পাপ নেই— এইসবও শুনতে হলো।

পাঠক শুনে বিস্মিত হবেন, পুরুষদের কেউ কোনো চুরি করতে পারে নি। পুরুষদের একজন শুধু একটা কমলা পকেটে নিয়ে ফিরেছে।

দ্বিতীয় দিন ছিল মহিলাদের পালা। তারা যে পরিমাণ খাবার চুরি করেছে তা দিয়ে বাকি সবাই এক সপ্তাহ নাশতা খেতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদ এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা এই ঘটনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে কি উপনীত হতে পারেন?

নিষিদ্ধ নগরে তুষার ঝড়

নিষিদ্ধ পল্লীর কথা আমরা জানি। নিষিদ্ধ পল্লী— Red Light Area. যেখানে নিশিকন্যারা থাকেন। নগরের আনন্দপ্রেমীরা গোপনে ভিড় করেন। নিষিদ্ধ নগরী কী?

নিষিদ্ধ নগরীতে তুষার ঝড়ের কবলে মাজহার পুত্র অমিয়

নিষিদ্ধ নগরীতে তুষারপাতের মধ্যে দাঁড়িয়ে সস্ত্রীক চ্যালেঞ্জার

নিষিদ্ধ নগরী হলো— Forbidden City. চায়নিজ ভাষায় গু গং (Gu Gong). বেইজিং-এর ঠিক মাঝখানে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা মিং এবং জিং (Ging) সম্রাটদের প্রাসাদ। বিশাল এক নগর। প্রজারা কখনো কোনোদিনও এই নগরে প্রবেশ করতে পারবে না। এমনই কঠিন নিয়ম। এই নগর প্রজাদের জন্যে নিষিদ্ধ বলেই নগরীর নাম 'নিষিদ্ধ নগরী'।

নগরীতে প্রাসাদ সংখ্যা কত ? আট শ'। প্রাসাদে ঘরের সংখ্যা আট হাজারের বেশি।

এই নগরীর নির্মাণ কাজ শুরু হয় ১৪০৬ সনে। দুই লক্ষ শ্রমিক ১৪ বৎসর অমানুষিক পরিশ্রম করে নির্মাণ শেষ করে। এই নগরীর কঠিন পাঁচিল এমন করে বানানো হয় যেন কামানের গোলা কিছুই করতে না পারে। সম্রাটরা ধরেই নিয়েছিলেন, তাদের কঠিন দেয়াল ভেঙে কেউ কোনোদিন ঢুকতে পারবে না। হায়রে নিয়তি! ব্রিটিশ সৈন্যরা ১৮৬০ সনে নিষিদ্ধ নগরী দখল করে নেয়। হতভম্ব সম্রাট শুধু তাকিয়ে থাকেন।

নিষিদ্ধ নগরীর শেষ সম্রাটের নাম পু ই (Pu Yi), ১৯১২ সনে তাঁকে সিংহাসন ছাড়তে হয়। শেষ হয় নিষিদ্ধ নগরীর কাল। শেষ সম্রাটকে নিয়ে যে ছবিটি বানানো হয়, The Last Emperor, সেটা হয়তো অনেকেই দেখেছেন।

না দেখে থাকলে দেখতে বলব, কারণ ছবিটি চীন সরকারের অনুমতি নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীর ভেতরেই শুট করা হয়। প্রথম নিষিদ্ধ নগরীর ভেতর ৩৫ মিমি ক্যামেরা ঢোকে।

রাজা-বাদশাদের বিলাসী জীবন কেমন ছিল তা দেখার আগ্রহ আমি কখনো বোধ করি নি। সব বিলাসের একই চিত্র। সোনা, রুপা, মণি মাণিক্য। হাজার হাজার রক্ষিতা। পান এবং ভোজন। এই বাইরে কী ?

কারো গান-বাজনার শখ থাকে, কেউবা ছবি আঁকেন, এইখানেই শেষ। সম্রাটদের সমস্ত মেধার সমাপ্তি নারী এবং সুরায়।

প্রথমবার নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকে এমন মন খারাপ হয়েছিল! মনে হচ্ছিল, চীনের হতদরিদ্র মানুষদের দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাতাস ভারী হয়ে আছে। রক্ষিতারা যেখানে থাকত সেখানে গেলাম। একসঙ্গে তিন হাজার রক্ষিতার থাকার ব্যবস্থা। প্রত্যেকের জন্যে পায়রার খুপড়ির মতো খুপড়িঘর। কী বিভৎস তাদের জীবন! ইচ্ছে হলে কোনো একদিন কিছুক্ষণের জন্যে এদের একজনকে সম্রাট ডেকে নেবেন। কিংবা নেবেন না। উপহার হিসেবে পাঠাবেন ভিনদেশের রাজা-মহারাজাদের কাছে।

নিষিদ্ধ নগরীর স্বর্গীয় পবিত্রতার প্রাসাদে রাজ সিংহাসন

নিষিদ্ধ নগরী

মোঘল সম্রাটরা বেশ কয়েকবার চীন সম্রাটদের কাছ থেকে রূপবতী চৈনিক মেয়ে উপহার পেয়েছেন।

এইসব রূপবতীদের সংগ্রহ করত রাজপুরুষরা। কোনো এক চাষীর ঘরে ফুটফুটে মেয়ে হয়েছে। মেয়ে বড় হয়েছে। বাবা-মা'কে ছেড়ে তাকে চিরদিনের জন্যে চলে যেতে হচ্ছে নিষিদ্ধ নগরীর উঁচু পাঁচিলের ভেতর।

সেবারে সম্রাটদের সুরাপাত্র এবং পিকদান দেখেছিলাম। সুরাপাত্র স্বর্ণের থাকবে এটা ধরে নেয়া যায়— থুথু ফেলার সব পাত্রও সোনার হতে হবে? মণি মাণিক্য খচিত হতে হবে? সম্রাটের থুথু এতই মূল্যবান?

যাই হোক, ভ্রমণ প্রসঙ্গে যাই। আমি দলবল নিয়ে নিষিদ্ধ নগরীতে ঢুকলাম। ছোট্ট বক্তৃতা দিলাম— অনেক মিউজিয়াম আছে। তোমরা দেখতে পার। দেখার কিছু নেই। কোন সোনার পাত্রে রাজা থুথু ফেলতেন, কোন হীরা মণি মাণিক্যের টাট্টিখানায় হাত করতেন তা দেখে কী হবে? তাছাড়া খুব বেশি জিনিসপত্র এখানে নেই।

অনেক কিছু লুট করে নিয়ে গেছে ব্রিটিশরা। তারা ব্রিটিশ মিউজিয়াম সাজিয়েছে। দ্বিতীয় দফায় লুট করা হয়েছে (১৯৪৭) চিয়াং কাই শেকের

নির্দেশে। তিনি সব নিয়ে গেছেন তাইওয়ানে। সেখানকার ন্যাশনাল প্যালেস মিউজিয়ামের বেশির ভাগ জিনিসপত্রই নিষিদ্ধ নগরীর।

সম্রাটদের প্রাসাদ দেখেও কেউ কোনো মজা পাবে না। সব একরকম। কোনো বৈচিত্র্য নেই। দোচালা ঘরের মতো ঘর। একটার পর একটা। ঢেউয়ের মতো।

আমার নেগেটিভ কথা সফরসঙ্গীদের উপর বিন্দুমাত্র ছাপ ফেলল না। তারা সবাই মুগ্ধ বিস্ময়ে বলল, একী! কী দেখছি! এত বিশাল! এত সুন্দর! এটা না দেখলে জীবন বৃথা হতো।

পরম করুণাময় আমার সফরসঙ্গীদের উচ্ছ্বাস হয়তো পছন্দ করলেন না। তিনি ঠিক করলেন তাঁর তৈরি সৌন্দর্য দেখাবেন। হঠাৎ শুরু হলো তুষারপাত। ধবধবে শাদা তুষার ঝিলমিল করতে করতে নামছে। যেন অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোছনার ফুল। যেন চাঁদের আলো ভেঙে ভেঙে নেমে আসছে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো নিষিদ্ধ নগর বরফের চাদরে ঢেকে গেল। আমি তাকিয়ে দেখি, চ্যালেঞ্জার এবং চ্যালেঞ্জার পত্নী কাঁদছে। আমি বললাম, কাঁদছ কেন?

চ্যালেঞ্জার বলল, বাচ্চা দুটোকে রেখে এসেছি। এত সুন্দর দৃশ্য তারা দেখতে পারল না, এই দুঃখে কাঁদছি। স্যার, আমি এই দৃশ্য আর দেখব না। হোটেলে ফিরে যাব।

শাওন মূর্তির মতো দাঁড়িয়েছিল। আমি বললাম, ক্যামেরাটা দাও, ছবি তুলে দেই। সে বলল, এই দৃশ্যের ছবি আমি তুলব না। ক্যামেরায় কোনোদিন এই দৃশ্য ধরা যাবে না।

অবাক হয়ে দেখি তার চোখেও পানি। সে আমাকে চাপা গলায় বলল, এমন অদ্ভুত সুন্দর দৃশ্য তোমার কারণে দেখতে পেলাম। আমি সারাজীবন এটা মনে রাখব।

মেয়েরা আবেগতাড়িত হয়ে অনেক ভুল কথা বলে। আমার কারণে যে-সব খারাপ অবস্থায় সে পড়েছে সেসবই তার মনে থাকবে, সুখস্মৃতি থাকবে না। মেয়েরা কোনো এক গুঢ়ি কারণে দুঃখস্মৃতি লালন করতে ভালোবাসে।

অন্য সফরসঙ্গীদের কথা বলি। মাজহার তুষারপাতের ছবি নানান ভঙ্গিমায় তুলতে গিয়ে পিচ্ছিল বরফে আছাড় খেয়ে পড়েছে। তার দামি ক্যামেরার এইখানেই ইতি। কমলের কাছে মাজহার হলো গুরুদেব। গুরুদেব আছাড় খেয়েছেন, সে এখনো খায় নি— এটা কেমন কথা! গুরুদেবের অসম্মান। কমল তার মেয়ে আরিয়ানাসহ গুরুদেবের সামনেই ইচ্ছা করে আছাড় খেয়ে লম্বা হয়ে পড়ে রইল।

চীন ভ্রমণ শেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, সবচে' আনন্দ পেয়েছ কী দেখে ? গ্রেটওয়াল ? ফরবিডেন সিটি, টেম্পল অব হেভেন, সামার প্যালেস ?

সবাই বলল, নিষিদ্ধ নগরে তুষারপাত।

তুষার সন্ধ্যা নিয়ে লেখা রবার্ট ফ্রস্টের প্রিয় কবিতাটি মনে পড়ে গেল।

STOPPING BY WOODS ON A SNOWY EVENING

Whose woods these are I think I know.
His house is in the village though;
He will not see me stopping here
To watch his woods fill up with snow.

My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near
Between the woods and frozen lake
The darkest evening of the year.

He gives his harness bells a shake
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of easy wind and downy flake.

The woods are lovely, dark and deep.
But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,
And miles to go before I sleep.

দীর্ঘতম কবরখানা

পৃথিবীর দীর্ঘতম কবরখানার দৈর্ঘ্য কত ? পনেরশ' মাইল। আরো লম্বা ছিল— তিনহাজার নয়শ' চুরাশি মাইল। বর্তমানে অবশিষ্ট আছে পনেরশ' মাইল। চায়নার বিখ্যাত গ্রেটওয়ালের কথা বলছি। এই অর্থহীন দেয়াল তৈরি করতে এক লক্ষের উপর শ্রমিক প্রাণ হারিয়েছে। দেয়াল না বলে কবরখানা বলাই কি যুক্তিযুক্ত না!

অর্থহীন দেয়াল বলছি, কারণ যে উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছিল, মোঙ্গলদের হাত থেকে সাম্রাজ্য রক্ষা, সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। মোঙ্গলরা এবং মাঞ্চুরিয়ার দুর্ধর্ষ গোত্র বারবারই দেয়াল অতিক্রম করেছে।

গ্রেটওয়াল বিষয়ে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিচ্ছি। পবিত্র কোরআন শরীফের একটি সূরা আছে— সূরা কাহাফ। কাহাফের ভাষ্য অনুযায়ী অনেকে মনে করেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এই প্রাচীর নির্মাণ করেন।

ওরা বলল, 'হে জুলকারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা এই শর্তে কর দেব যে, তুমি আমাদের এবং ওদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দেবে।' (১৮; ৯৪)

জুলকারনাইন স্থানীয় অধিবাসীদের শ্রমেই প্রাচীর তৈরি করে দেন।

আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট যে আমাদের নবীদের একজন, এই তথ্য কি পাঠকরা জানেন ? জুলকারনাইন হলেন আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট।

চীনের ইতিহাস বলে মোট পাঁচ দফায় প্রাচীর তৈরি হয়। প্রথম শুরু হয় জিন ডায়ানেস্টির আমলে (Qin Dynasty), যিশুখ্রিষ্টের জন্মের ২০৮ বছর আগে। বর্তমানে যে প্রাচীর আছে তা তৈরি হয় সম্রাট হংগু (মিং ডায়ানেস্টি, ১৩৬৮ সন)-এর শাসনকালে। শেষ করেন সম্রাট ওয়ানলি (মিং ডায়ানেস্টি, ১৬৪০)।

প্রাচীরের গড় উচ্চতা ২৫ ফিট। তিন লক্ষ শ্রমিকের তিনশ' বছরের অর্থহীন শ্রম। কোনো মানে হয় ? কোনো মানে হয় না। মানব সম্পদের এই অপচয় সম্রাটরাই করতে পারেন। রাজা-বাদশাদের কাছে সাধারণ মানুষের জীবন সব সময়ই মূল্যহীন ছিল।

আমরা আজ যাব দীর্ঘতম কবরখানা দেখতে। চীনের পরিচয় চীনের দেয়াল। সেই দেয়াল দেখা সহজ বিষয় না। আমার সফরসঙ্গীদের আনন্দ-উত্তেজনায় টগবগ করার কথা। তারা কেমন যেন ঝিমিয়ে আছে। গা ছাড়া ভাব। কারণটা ধরতে পারলাম না।

এক পর্যায়ে মাজহার কাঁচুমাচু হয়ে বলল, গ্রেটওয়াল দেখার প্রোগ্রামটা আরেকদিন করলে কেমন হয়!

আমি বললাম, আজ অসুবিধা কী ?

কোনো অসুবিধা নেই। গতকাল ফরবিডেন সিটি দেখে সবাই টায়ার্ড। আজকে বিশ্রাম করতে পারলে ভালো হতো। মেয়েরা বিশেষ করে কাহিল হয়ে পড়েছে। নড়াচড়াই করতে পারছে না।

আমি বললাম, মেয়েরা যেহেতু ক্লান্ত তারা অবশ্যই বিশ্রাম করবে। গ্রেটওয়াল পালিয়ে যাচ্ছে না।

মাজহারের মুখ আনন্দে ঝলমল করে উঠল। একই সঙ্গে মেয়েদের মুখেও হাসি। একজন বলে ফেলল, দেরি করে লাভ নেই, চল রওনা দেই।

আমি বললাম, তোমাদের না রেস্ট নেবার কথা, যাচ্ছ কোথায় ?

মেয়েদের মুখপাত্র হিসেবে মাজহার বলল, সিল্ক মার্কেটে ট্রকটাক মার্কেটিং করবে। মেয়েদের মার্কেটিং মানেই বিশ্রাম।

মেয়েরা বিপুল উৎসাহে বিশ্রাম করতে বের হলো। দুপুর দু'টা পর্যন্ত এই দোকান থেকে সেই দোকান, দোতলা থেকে সাততলা, সাততলা থেকে তিনতলা, তিনতলা থেকে আবার ছয়তলা করে বিশ্রাম করল। প্রত্যেকের হাতভর্তি নানান সাইজের ব্যাগ। দুপুরে দশ মিনিটের মধ্যে লাঞ্চ শেষ করে আবার বিশ্রামপর্ব শুরু হলো।

সিল্ক মার্কেটের যত আবর্জনা আছে, তার বেশির ভাগ আমরা কিনে ফেললাম। মেয়েরা দরদাম করতে পারছে এতেই খুশি। কী কিনছে এটা জরুরি না। আমি একবার ক্ষীণ স্বরে বললাম, যা কিনছ সবই ঢাকায় পাওয়া যায়। সবাই আমার কথা শুনে এমনভাবে তাকাল যেন এত অদ্ভুত কথা কখনো তারা শোনে নি।

আমি ক্লান্ত, বিরক্ত এবং হতাশ। রাত দশটার আগে কারো বিশ্রাম শেষ হবে এমন মনে হলো না। বিশ্রামপর্ব দশটায় শেষ হবে, কারণ সিল্ক রোড বন্ধ হয়ে যাবে।

আমি কী করব বুঝতে পারছি না। কিছুক্ষণ মেয়েদের কেনাকাটা দেখলাম। এর মধ্যে এরা কিছু চায়নিজও শিখে নিয়েছে। দোকানি বলছে, ইয়ি বাই। তারা বলছে, উয়ু। জিজ্ঞেস করে জানলাম 'ইয়ি বাই' হলো একশ', আর 'উয়ু' হলো পাঁচ। মেয়েদের বিদেশী ভাষা শেখার ক্ষমতা দেখে বিস্মিত হয়ে নিজের মনে কিছুক্ষণ ঘুরলাম। একদিকে শিল্পীদের মেলা বসেছে। একজন হাতের বুড়ো আঙুলে চায়নিজ ইংক লাগিয়ে নিমিষের মধ্যে অতি অপূর্ব ছবি বানাচ্ছেন। আমার আগ্রহ দেখে তিনি আমার আঙুলে কালি লাগিয়ে কাগজ এগিয়ে দিলেন। আমি অনেক চেষ্টা করেও কিছু দাঁড়া করতে পারলাম না। শিল্পী যেমন আছে ভাস্করও আছে। সিল্ক মার্কেটের এক কোনায় দেখি এক চাইনিজ বুড়ো একদলা মাটি নিয়ে বসে আছে। দুশ' ইয়েনের বিনিময়ে সে মাটি দিয়ে অবিকল মূর্তি বানিয়ে দেবে। তার সামনে বিশ মিনিট বসলেই হবে। বিশ মিনিট বসে বিশ্রাম নেবার সুযোগ পাওয়া যাবে ভেবেই বসলাম। একজন ভাস্কর কীভাবে কাজ করে তা দেখার আগ্রহ তো আছেই।

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ আমাকে দেখে অতিদ্রুত মাটি ছানতে শুরু করল। কুড়ি মিনিটের জায়গায় আধঘণ্টা পার হলো। মূর্তি তৈরি। আমি বললাম, কিছু মনে করো না, মূর্তিটা আমার না। চায়নিজ কোনো মানুষের।

শাওন বসে আছেন, চীনা ভাস্কর তার মূর্তি গড়ছেন।

মূর্তির চোখ পুতি পুতি। নাক দাবানো।

বুড়ো বলল, তোমার চেহারা তো পুরোপুরি চায়নিজদের মতো।

আমি বললাম, তাই না-কি ?

বুড়ো বলল, অবশ্যই।

আশেপাশের সবাই বুড়োকে সমর্থন করল। আমিও নিশ্চিত হলাম আমার চেহারা চৈনিক। ইতিমধ্যে শাওন চলে এসেছে। তার কাছে ইয়েন যা ছিল সব শেষ। আমাকে যেতে হবে ডলার ভাঙাতে। সে বলল, তুমি চায়নিজ এক বুড়োর মূর্তি হাতে নিয়ে বসে আছ কেন ?

আমি গম্ভীর গলায় বললাম, চায়নিজ বুড়ো তোমাকে কে বলল ? এটা আমার নিজের ভাস্কর্য। উনি বানিয়েছেন। উনি একজন বিখ্যাত ভাস্কর।

কত নিয়েছে ?

দুশ' ইয়েন।

আমাকে ডাকলে না কেন! আমি পঁচিশ ইয়েনে ব্যবস্থা করতাম।

বলেই সে দেরি করল না, দরাদরি শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবাক

এক যুগ আগেও নেইজিং-এ ম্যাসাজ পার্লার চোখে পড়ে নি। আধুনিক চীনের অনেক রূপান্তরে এটি একটি।

হয়ে দেখি, আমাদের মহান ভাস্কর ত্রিশ ইয়েনে শাওনের মূর্তি বানাতে রাজি হয়েছেন।

শাওন বলল, তুমি ডলার ভাঙিয়ে নিয়ে এসো, ততক্ষণ উনি আমার একটা মূর্তি বানাবেন। আমার খানিকক্ষণ রেস্টও হবে। পা ফুলে গেছে।

ডলার ভাঙিয়ে ফিরে এসে দেখি, মহান ভাস্কর চায়নিজ এক মেয়ের মূর্তি বানিয়ে বসে আছেন। শাওন খুশি। মূর্তির কারণে না। শাওন খুশি কারণ মহান ভাস্কর তার মোটা নাককে শাওনের অনুরোধে খাড়া করে দিয়েছেন। চেহারা চায়নিজ মেয়েদের মতো হলেও নাক তো খাড়া হয়েছে।

আমরা হোটেলে ফিরলাম রাত আটটায়। কে কী কিনল সব ডিসপ্লে করা হলো। সবার ধারণা হলো তারা যা কিনেছে সেটা ভালো না। অন্যদেরটা ভালো। মাজহারের মুখ হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। 'একটু আসছি' বলে সে বের হয়ে গেল। ফিরল রাত দশটায়। শাওন কিছু মুখোশ কিনেছে, যেগুলি সে কিনে নি। মাজহার গিয়েছিল ঔষুলি কিনতে।

আমি ঠাট্টা করছি না, সারাদিনের বিশ্রামের কারণে সব মেয়ের পা ফুলে গেল। তারা ঠিক করল ফুট ম্যাসাজ করাবে। হোটেলের কাছেই বিশাল ম্যাসাজ পার্লার।

ম্যাসাজের বিষয়টা এবার দেখছি। এক যুগ আগে ম্যাসাজ পার্লার চোখে পড়ে নি। আধুনিক চীনের অনেক রূপান্তরের একটি একটি। আমাদের হোটেল থেকে ম্যাগডোনাল্ড রেস্টুরেন্টের দূরত্ব দশ মিনিটের হাঁটা পথ। এর মধ্যে চারটা ম্যাসাজ পার্লার। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ম্যাসাজ পার্লারে ম্যাসাজ নিচ্ছে চায়নিজরাই। কঠিন পরিশ্রমী চৈনিক জাতি গা টেপাটেপির ভক্ত হয়ে পড়েছে। মাও সে তুং-এর মাথায় নিশ্চয়ই এই জিনিস ছিল না।

রাস্তায় প্রসটিটিউটরাও নেমেছে। রূপবতী কন্যারা বিশেষ এক ধরনের কালো পোশাক পরে নির্বিকার ভঙ্গিতে ঘুরছে। কেউ তাদেরকে নিয়ে বিব্রত বা চিন্তিত না। এমন একজনের পাল্লায় আমি নিজেও একদিন পড়েছিলাম। ঘটনাটা বলি, বাংলাদেশ অ্যাম্বেসির ফার্স্ট সেক্রেটারি আমাকে বইয়ের দোকানে নিয়ে যাচ্ছেন। দু'জন গল্প করতে করতে এগুচ্ছি, হঠাৎ কালো পোশাকের এক তরুণী এসে আমার হাত ধরল। আমি বিস্মিত হয়ে তাকালাম। রূপবতী এক তরুণী। মায়া মায়া চেহারা। সে আদুরে গলায় বলল, আমাকে তুমি তোমার হোটেলে নিয়ে চল। আমি ম্যাসাজ দেব। বলেই চোখে কুৎসিত ইশারা করল। এমন নোংরা ইশারা চোখে করা যায় আমার জানা ছিল না। আমি হতভম্ব।

মনিরুল হক ধমক দিয়ে মেয়েটিকে সরিয়ে বিরক্ত গলায় বললেন, বর্তমান চীনে এই বিষয়টা খুব বেড়েছে। আমি বললাম, পুলিশ কিছু বলে না? মনিরুল হক বললেন, না।

পার্ল এস বাকের 'গুড আর্থের' চীন এবং বর্তমান চীন এক না। এই দেশ আরো অনেকদূর যাবে। ক্ষমতায় ও শক্তিতে পাল্লা দেবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে। মানুষ বদলাবে, মূল্যবোধ বদলাবে। ঘরের দরজা-জানালা খুলে দিলে আলো-হাওয়া যেমন ঢোকে— কিছু মশা-মাছিও ঢোকে। মহান চীন তার দরজা-জানালা খুলে দিয়েছে। আলো-হাওয়া এবং মশা-মাছি ঢুকছে।

মূল গল্পে ফিরে আসি। পরের দিন গ্রেটওয়াল দেখতে যাবার কথা, যাওয়া হলো না, কারণ সফরসঙ্গীরা যে যার মতো মার্কেটে চলে গেছে। সবাই বলে গেছে এক ঘণ্টার মধ্যে ফিরবে। তারা ফিরল সন্ধ্যায়। প্রত্যেকের হাতভর্তি ব্যাগ। মুখে বিজয়ীর হাসি।

শেষ পর্যন্ত গ্রেটওয়াল দেখা হলো। সেও এক ইতিহাস। ব্যবস্থা করল এক ট্যুর কোম্পানি। তারা গ্রেটওয়াল দেখাবে। ফাও হিসেবে আরো কিছু দেখাবে ফ্রি। জনপ্রতি ভাড়া একশ' ডলার। সেখানেও দরাদরি। কী বিপদজনক দেশে এসে পৌঁছলাম! একেকবারে আমরা বলছি— 'না, পোষাচ্ছে না।' বলে চলে আসার উপক্রম করতেই তারা বলে, 'একটু দাঁড়াও, ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে কথা বলে দেখি।' তারা চ্যাঁও চু করে কিছুক্ষণ কথা বলে, তারপর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'ম্যানেজমেন্ট আরো দু'ডলার করে কমাতে রাজি হয়েছে।'

শেষ পর্যন্ত ১০০ ডলার ভাড়া কমিয়ে আমরা ত্রিশ ডলারে নিয়ে এলাম। বাচ্চাদের টিকিট লাগবে না। তারা ফ্রি। ট্যুর কোম্পানির রূপবতী অপারেটর নিচু গলায় বলল, তোমাদের যে এত সস্তায় নিয়ে যাচ্ছি খবরদার এটা যেন অন্য ট্যুরিস্টরা না জানে। জানলে কোম্পানি বিরাট বিপদে পড়ে যাবে।

ট্যুর কোম্পানির বাসে উঠার পরে জানলাম, ট্যুরিস্টরা যাচ্ছে বিশ ডলার করে। একমাত্র আমরা ত্রিশ ডলার। অস্ট্রেলিয়ার এক গান্ধী সাহেব-মেম শুধু একশ' ডলার করে টিকিট কেটেছে। হিমালয়ার সেই গান্ধী দম্পতির সঙ্গে আমার ভালোই খাতির হয়েছিল। আমরা একসঙ্গে চায়নিজ হার্বাল চিকিৎসা নিয়েছি, সেই প্রসঙ্গে পরে আসব।

কোম্পানির বাস সরাসরি আমাদের গ্রেটওয়ালে নিয়ে গেল না। জেড তৈরির এক কারখানায় এনে ছেড়ে দিল। যদি আমরা জেডের তৈরি কিছু কিনতে চাই। ট্যুর কোম্পানির সঙ্গে জেড কারখানার বন্দোবস্ত করা আছে। ট্যুর কোম্পানি যাত্রীদের এনে এখানে ছেড়ে দেবে। কিছু ব্যবসা-বাণিজ্য হবে। বিনিময়ে কমিশন।

পাঠকদের মধ্যে যারা আগ্রার তাজমহল দেখেছেন, তারা এই বিষয়টি জানেন। তাজমহল দর্শনার্থীরা সরাসরি তাজ দেখতে যেতে পারেন না। তাদেরকে মিনি তাজ বলে এক বস্তু প্রথমে দেখতে হয়। সেখানকার লোকজন সবাই কথাশিল্পী। তাদের কথার জালে মুগ্ধ হয়ে মিনি তাজ কিনতে হয়। সেই মিনি তাজ আজ পর্যন্ত কেউ অক্ষত অবস্থায় বাংলাদেশে আনতে পারেন নি। বর্ডার পার হবার আগেই অবধারিতভাবে সেই তাজ ভেঙে কয়েক টুকরা হবেই।

জেড এম্পোরিয়াম থেকে কেনাকাটা শেষ করে বাসে উঠলাম, ভাবলাম এইবার বোধহয় গ্রেটওয়াল দেখা হবে। ঘণ্টাখানিক চলার পর বাস থামল আরেক দোকানে। এটা না-কি সরকার নিয়ন্ত্রিত মুক্তার কারখানা। ঝিনুক চাষ করা হয়। ঝিনুক থেকে মুক্তা বের করে পালিশ করা হয়— নানান কর্মকাণ্ড।

একজন মুক্তা বিশেষজ্ঞ সব ট্যুরিস্টকে একত্র করে মুক্তার উপর জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দিলেন। মুক্তার প্রকারভেদ, ঔজ্জ্বল্য, এইসব বিষয়ে পরিপূর্ণ জ্ঞান দান করে তিনি ঘোষণা করলেন— এইবার আপনাদের সামনে আমি একটা ঝিনুক খুলব। আপনারা অনুমান করবেন ঝিনুকের ভেতর মুক্তার সংখ্যা কত। যার অনুমান সঠিক হবে তাকে আমাদের পক্ষ থেকে একটা মুক্তা উপহার দেয়া হবে। এইখানেই শেষ না, আপনাদের ভেতর যেসব মহিলা ট্যুরিস্ট আছেন তাদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা। সবচে' রূপবতীকেও একটা মুক্তা উপহার দেয়া হবে।

মেয়েদের মধ্যে টেনশন এবং উত্তেজনা। মেকাপ ঠিক করা দরকার। সেই সুযোগ কি আছে?

চায়নিজ ভদ্রলোক (চেহারা অবিকল অভিনেতা ব্রুসলীর মতো) বড় সাইজের একটা ঝিনুক তুলে আমাকেই প্রথম জিজ্ঞেস করলেন, বলো এর ভেতর ক'টা মুক্তা?

একটা ঝিনুকে একটাই মুক্তা থাকার কথা। এরকমই তো জানতাম। আমি বললাম, একটা।

সফরসঙ্গীরা আমাকে নানান বিষয়ে জ্ঞানী ভাবে। তারা মনে করল এটাই সত্যি উত্তর। প্রত্যেকেই বলল, একটা। শুধু বলেই ক্ষান্ত হলো না, জ্ঞানীর হাসিও হাসল। যে হাসির অর্থ— কী ধরা তো খেলে! এখন দাও সবাইকে একটা করে মুক্তা।

সফরসঙ্গীদের মধ্যে শুধু চ্যালেঞ্জার বলল, সতেরোটা। চ্যালেঞ্জারের বোকামিতে আমরা সবাই যথেষ্ট বিরক্ত হলাম।

ঝিনুক খোলা হলো। ঝিনুক ভর্তি মুক্তা। মুক্তা গোনা হলো এবং দেখা গেল মুক্তার সংখ্যা ১৭। কাকতালীয় এই ঘটনার ব্যাখ্যা আমি জানি না। আমি আমার এক জীবনে অনেক কাকতালীয় ঘটনার সম্মুখীন হয়েছি। এটি তার একটি। চ্যালেঞ্জারকে একটা বড়সড় মুক্তা দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে চ্যালেঞ্জারের চোখে পানি। তার চোখের অশ্রু গ্ল্যান্ডে মনে হয় কোনো সমস্যা আছে, সে কারণে এবং সম্পূর্ণ অকারণে চোখ থেকে এক দেড় লিটার পানি ফেলতে পারে।

ঝিনুক খোলা হলো। ঝিনুক ভর্তি মুক্তা। মুক্তা গোনা হলো এবং দেখা গেল মুক্তার সংখ্যা ১৭।

শ্রেষ্ঠ রূপবতীর পুরস্কার পেল শাওন। সে এমন এক ভঙ্গি করল যেন শেষ মুহূর্তে সে বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতায় রানার্সআপকে পরাজিত করে সোনার মুকুট জিতে নিয়েছে।

কমল তার স্ত্রীর উপর খুব রাগ করল, ধমক দিয়ে বলল, কোথাও বেড়াতে গেলে সাজগোজ করে বের হবে না? ঢাকা থেকে তো দুনিয়ার সাজের জিনিস নিয়ে এসেছ, এখন ঘুরছ ফকিরনীর মতো।

মুক্তা বিষয়ক জটিলতা শেষ করে বাস ছুটছে গ্রেটওয়ালের দিকে। একসময় থামল। আমরা কৌতূহলী হয়ে তাকালাম। কোথায় গ্রেটওয়াল? চায়নিজ হার্বাল মেডিসিনের বিশাল দালান। হার্বাল বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে না-কি হার্বাল মেডিসিনের কিংবদন্তি ডাক্তারেরা আমাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করবেন। শুধু ওষুধপত্র নগদ ডলারে কিংবা ক্রেডিট কার্ডে কিনতে হবে।

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয় বনাম বাংলাদেশের কয়েকজন গবেট

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে বাস থেমেছে, আমরা হৈচৈ করে নামছি। ওমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মকর্তা ছুটে এলেন। চাপা গলায় নিখুঁত ইংরেজিতে বললেন, বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা। ক্লাস চলছে, অধ্যাপকরা গবেষণা করছেন। হৈচৈ চলবে না। পিন পাতনিক নৈঃশব্দ্য বজায় রাখতে হবে।

আমরা গেলাম ঘাবড়ে। মায়েরা নিজেদের বাচ্চাদের মুখ চেপে ধরলেন। এ-কী ঝামেলা! রওনা হয়েছি গ্রেট ওয়াল দেখতে, এ কোন চক্করে এসে পড়লাম?

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মকর্তা আমাদের হলঘরের মতো ঘরে দাঁড় করিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন। হলঘরের চারপাশে নানান ধরনের ভেষজ গাছ। প্রতিটির গায়ে চায়নিজ নাম, বোটানিকেল নাম। দু'টি গাছ চিনলাম। একটি আমাদের অতিপরিচিত ঘৃতকুমারী, অন্যটা জিনসেং, যৌবন ধরে রাখার ওষুধ। দেয়ালে বিশালাকৃতির ছবি। একটিতে মাও সে তুং ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করছেন। অন্য একটিতে World Health Organization-এর প্রধানের সঙ্গে হাসি হাসি মুখে কী যেন আলোচনা করছেন। বিদেশী যেসব ছাত্র-ছাত্রী ভেষজ বিদ্যা শিখতে এসেছে তাদের ছবিও আছে।

হলঘরের এক প্রান্তে অতি বৃদ্ধ এক চায়নিজের মর্মর পাথরের মূর্তি। ভারতবর্ষের ভেষজ বিজ্ঞানের জনক যেমন মহর্ষি চরক, এই চায়নিজ বৃদ্ধও (নাম মনে নেই) চৈনিক ভেষজ বিজ্ঞানের জনক। সফরসঙ্গীরা চৈনিক ভেষজ বিজ্ঞানীর সামনে নানান ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। আমি ভাবছি কখন এই

চক্কর থেকে উদ্ধার পাব।

মিনিট পাঁচেক পার হলো, এক অতি স্মার্ট তরুণী ঢুকল। সে পোশাকে স্মার্ট। ইংরেজি কথা বলায় স্মার্ট। পুরো চীন ভ্রমণে আমার দেখা মতো সবচে' স্মার্ট তরুণী। সে আমাদের একটি সুসংবাদ দিল।

সুসংবাদটা হচ্ছে, ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাজ্ঞানী চিকিৎসকরা বিনামূল্যে আমাদের শরীরের অবস্থা দেখতে রাজি হয়েছেন। আমরা যে অতি দূরদেশ থেকে এখানে এসেছি, ভেষজ চিকিৎসা সম্পর্কে আগ্রহ দেখাচ্ছি, তার কারণেই আমাদের প্রতি এই দয়া।

আমরা কৃতজ্ঞতায় ছোট হয়ে গেলাম এবং ভেষজ চিকিৎসকদের মহানুভবতায় হলাম মুগ্ধ ও বিস্মিত।

আমাদের একটা ঘরে ঢুকিয়ে দেয়া হলো। স্মার্ট তরুণী ব্যাখ্যা করলেন আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্র, বিশেষ করে অ্যান্টিবায়োটিক, কী করে আমাদের জীবনীশক্তি সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিচ্ছে। ভেষজ বিজ্ঞানই আমাদের একমাত্র পরিত্রাতা। তিনি জানালেন, তিনজন চিকিৎসক একসঙ্গে ঘরে ঢুকবেন। তাঁরা কেউ চৈনিক ভাষা ছাড়া কিছুই জানেন না। সবার সঙ্গে একজন করে ইন্টারপ্রেটার থাকবে।

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে চ্যান্সেলর ও চ্যান্সেলর পত্নী।

ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে শুকনো ফলের মেলা।

মহান চিকিৎসকরা আমাদের মল-মূত্র-কফ কিছুই পরীক্ষা করবেন না। নাড়ি দেখে সব বলে দেবেন।

আমরা আবারো অভিভূত।

নাড়ি দেখে রোগ নির্ণয় বিষয়ে তারাশংকরের বিখ্যাত উপন্যাস আছে— 'আরোগ্য নিকেতন'। সেই উপন্যাসের আয়ুর্বেদশাস্ত্রী কবিরাজ নাড়ি দেখে মৃত্যুব্যাধি ধরতে পারতেন। আমার ভেতর রোমাঞ্চ হলো এই ভেবে যে, উপন্যাসের একটি চরিত্র বাস্তবে দেখব।

স্মার্ট তরুণী বললেন, মহান ভেষজবিদদের সম্বন্ধে শেষ কথা বলে বিদায় নিচ্ছি। আধুনিক ডাক্তাররা নাড়ি ধরে শুধু Pulse beat শোনে। আমাদের মহান শিক্ষাগুরুরা নাড়ি ধরেই হার্ট, লিভার, কিডনি এবং রক্ত সঞ্চালন ধরেন। প্রাচীন চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই হলো মহত্ত্ব। এই বিদ্যা হারিয়ে যাচ্ছিল, আমাদের ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয় তা পুনরুদ্ধার করেছে। আপনারা কি এই আনন্দ সংবাদে হাততালি দিবেন?

আমরা মহা উৎসাহে হাততালি দিলাম।

স্মার্ট তরুণী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, আমাদের মহান চিকিৎসকরা

প্রবেশ করছেন, আপনারা যথাযোগ্য সম্মানের সঙ্গে তাদের সঙ্গে আচরণ করবেন, এই আমার বিনীত অনুরোধ।

দরবারে মহারাজার প্রবেশের মতো দুই বৃদ্ধ এক বৃদ্ধা প্রবেশ করলেন। দেখেই মনে হচ্ছে— তাদের জীবন থেকে রস কষ নিঃশেষ হয়ে গেছে। চোখে মুখে ক্লান্তি ও হতাশা।

আমরা সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করলাম। তারা তিনজনই বিড়বিড় করে কী যেন বললেন।

স্মার্ট তরুণী বললেন, আপনারা তিনজন করে আসুন। আপনাদের কী অসুখ কিছুই বলতে হবে না। উনারা নাড়ি ধরে সব জানবেন।

প্রথমে গেলাম আমি, মাজাহার এবং কমল। তিনজনেরই বুক ধড়ফড় করছে— না জানি কী ব্যাধি ধরা পড়ে।

বৃদ্ধ ভেষজ মহাজ্ঞানী অনেকক্ষণ আমার নাড়ি ধরে ঝিম ধরে রইলেন। তারপর চোখ খুলে বললেন, হার্টের অসুখ।

আমি তাঁর ক্ষমতায় মুগ্ধ হয়ে ঘনঘন কয়েকবার হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লাম।

তিনি বলজেন, আগে আমাদের কাছে এলে বুক কেটে চিকিৎসা করার প্রয়োজন হতো না।

দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যখন ছুটে যেত তখন তাদের কেমন লাগত!

আমি আরো মুগ্ধ। এই জ্ঞানবৃদ্ধ নাড়ি ধরে জেনে ফেলেছেন যে, আমার বাইপাস হয়েছে। কী আশ্চর্য!

তোমার রক্ত দূষিত। সব রক্ত নষ্ট হয়ে গেছে। রক্ত ঠিক করতে হবে।

আপনি দয়া করে ঠিক করে দিন।

স্নায়ুতন্ত্রেও সমস্যা। রক্তের সঙ্গে স্নায়ুও ঠিক করতে হবে।

দয়া করে স্নায়ুও ঠিক করে দিন।

আমি প্রেসক্রিপশন দিচ্ছি। ছ'মাস ওষুধ খেতে হবে। তোমার সমস্যা মূল থেকে দূর করা হবে।

ধন্যবাদ, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

ওষুধগুলি ভেষজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্রাগ স্টোর ছাড়া কোথাও পাবে না। তোমার ভদ্রতা এবং ভেষজ বিজ্ঞানের প্রতি বিশ্বাস আমাকে মুগ্ধ করেছে বিধায় তুমি বিশেষ কমিশনে ওষুধগুলি পাবে। দামটা দিবে ডলারে। ডলার না থাকলে ক্রেডিট কার্ড।

আমি উনার হাতে ক্রেডিট কার্ড তুলে দিলাম। একবার মনে হলো পা ছুঁয়ে সালাম করে ফেলি।

উনার কাছ থেকে বের হয়ে আমি দলের অন্যদের মুগ্ধ গলায় মহান ভেষজ বিজ্ঞানীর নাড়িজ্ঞানের কথা বললাম। কী করে নাড়িতে হাত দিয়েই তিনি আমার বাইপাসের কথা বলে ফেললেন সেই গল্প।

শাওন বলল, তোমার যে বাইপাস হয়েছে এটা বলার জন্যে কোনো ভেষজ বিজ্ঞানী লাগে না। যে কেউ বলতে পারে।

আমি বললাম, কীভাবে?

তোমার বুক যে কাটা এটা শার্টের কলারের ফাঁক দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। যে হাতে নাড়ি ধরা হয়েছে সেই হাতও কাটা। হাত কেটে রগ নেয়া হয়েছে।

আমি থমকে গেলাম। শাওন বলল, তুমি কি ওষুধ কেনার জন্যে টাকা-পয়সা দিয়েছ?

আমি মিনমিন করে বললাম, হ্যাঁ।

কত দিয়েছ?

কত এখনো জানি না, ক্রেডিট কার্ড নিয়ে গেছে।

শাওন বলল, কী সর্বনাশ!

আমি বিড়বিড় করে বললাম, সর্বনাশ তো বটেই।

মাজহারের সঙ্গে ডাক্তারের কথাবার্তা এখন তুলে দিচ্ছি।

ডাক্তার : হুঁ হুঁ। তোমার কিডনি প্রায় শেষ। এখন রক্ষা না করলে আর রক্ষা হবে না।

মাজহার : বলেন কী!

ডাক্তার : তোমার মাথায় চুল যে নেই তার কারণ কিডনি।

মাজহার : আপনার মাথায়ও তো কোনো চুল নেই। আপনারও কি কিডনি সমস্যা?

ডাক্তার : (চুপ)

মাজহার : আপনি আপনার নিজের কিডনির চিকিৎসা কেন করছেন না ?

ডাক্তার : তোমার যা দেখার দেখেছি— Next যে তাকে পাঠাও।

মাজহারের নির্বুদ্ধিতার অনেক গল্প আছে। তার বুদ্ধিমত্তার এই গল্পটি আমি অনেকের সঙ্গেই আগ্রহের সঙ্গে করি।

কমলের বেলাতেও দেখা গেল তার রক্ত দূষিত। লিভার অকার্যকর, স্নায়ুতন্ত্রে ঝিমুনি। কমল জীবন সম্পর্কে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়ল। সে বলল, আমি যে গাড়িতে উঠেই ঘুমিয়ে পড়ি, এখন তার কারণ বুঝলাম। আমার স্নায়ুতন্ত্রেই ঝিমুনি।

আমি ছাড়া পুরো দলের কেউ এক ডলারের ওষুধও কিনল না। কমল কিনতে চাচ্ছিল, মাজহারের ধমকে চুপ করে গেল। আমি চারশ' ডলারের ওষুধ কিনলাম। অস্ট্রেলিয়ান গাধাটারও নাকি কমলের মতো সমস্যা— রক্ত দূষিত, লিভার অকার্যকর, স্নায়ুতন্ত্রে ঝিমুনি। সে কিনল এক হাজার ডলারের ওষুধ। ছয় মাসের সাপ্লাই।

চারশ' ডলারের ওষুধের এক পুরিয়াও আমি খাই নি। নিজের বোকামির নিদর্শন হিসেবে জমা করে রেখে দিয়েছি। পাঠকদের জন্যে তার একটা ছবি দেয়া হলো।

ভেষজ বৃক্ষ নিয়ে আমার নিজের যথেষ্টই উৎসাহ আছে। নুহাশ পল্লীতে যে ভেষজ উদ্যান তৈরি করেছি তাতে ২৪০ প্রজাতির গাছ আছে। তারপরেও বলছি, এই শতকে এসে পুরনো গাছগাছড়ায় ফিরে যাওয়ার চিন্তা হাস্যকর। গাছগাছড়া থেকেই আমরা আধুনিক ওষুধে এসেছি। বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান কঠিন পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিজ্ঞান। শত শত বৎসরের সাধনায় এই বিজ্ঞান বর্তমান পর্যায়ে এসেছে। এখান থেকে আরো অনেকদূর যাবে। একে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস কারোই থাকা উচিত নয়।

প্রাচীন চৈনিক ভেষজ বিজ্ঞান সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ফুলে ফেঁপে উঠেছিল। সম্রাটরা পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন নিজেদের স্বার্থে। তারা চেয়েছেন অমরতা, ভোগ করার ক্ষমতা। প্রাচীন ভেষজ বিজ্ঞান সম্রাটদের অমরত্বের ওষুধ দিতে পারে নি। চিরস্থায়ী যৌবনের ওষুধও দিতে পারে নি। আমার ধারণা আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান কোনো একদিন পারবে।

চেঙ্গিজ খাঁ'র সঙ্গে চীন দেশীয় চারজন ভেষজ বিজ্ঞানীর সাক্ষাৎকার বিষয়ক একটি গল্প বলি।

চারশ' ডলারের আগাছা ওষুধ।

চেঙ্গিজ খাঁ বৃদ্ধ এবং অশক্ত। মৃত্যুভীতি ঢুকে গেছে। তিনি মৃত্যু নিবারক ওষুধ চান। অর্থ যা প্রয়োজন তারচেয়েও বেশি দেয়া হবে, ওষুধ চাই। বার্ধক্য রোধ করতে পারে, এমন ওষুধ কি পাওয়া যাবে ?

চেঙ্গিজ খাঁ বললেন, পারবেন আপনারা বানিয়ে দিতে ?

চারজনের মধ্যে তিনজনই বললেন, অবশ্যই পারব। বিশেষ বিশেষ লতাগুল্ম আছে। সময় লাগবে। একেক গুল্ম একেক সময়ে জন্মায়। তবে পারব। না পারার কিছু নেই।

শুধু একজন বললেন, জরা ও মৃত্যু জীবনের স্বাভাবিক পরিণতি। একে কিছুতেই আটকানো যাবে না।

চেঙ্গিজ খাঁ সেই চিকিৎসককে বললেন, ধন্যবাদ। বাকি তিনজনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দিলেন।

ভালো কথা, আমরা যে তিনজনের পাল্লায় পড়েছিলাম তারা কোন দলের ?

পুরনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। চারশ' ডলারের ওষুধের বস্তা হাতে নিয়ে গাড়িতে উঠলাম। গাড়ি এবার সত্যি সত্যি গ্রেটওয়ালের কাছে এনে রাখল।

সবার মনে আনন্দ। শুধু আমার এবং কমলের মন ভালো না। কমলের মন ভালো নেই, কারণ মাজহারের চোখ রাঙানির কারণে তার চিকিৎসা হয় নি।

গ্রীষ্ম প্রাসাদ দেখে সবাই মুগ্ধ। সম্রাজ্ঞিরা রাজকোষ ঢেলে দিয়েছেন নিজের গ্রীষ্ম প্রাসাদ বানাতে। সম্রাজ্ঞিরা গরমে কষ্ট করবেন তা কী করে হয়?

আমার মন ভালো নেই, কারণ আমার চিকিৎসা হয়েছে।

সফরসঙ্গীরা হৈ হৈ করে গ্রেটওয়ালে ছোটাছুটি করছে। তাদের ক্যামেরা বিরামহীনভাবে ক্লিক ক্লিক করছে। গ্রেটওয়াল না, গ্রেটওয়ালের পাশে তাদেরকে কেমন দেখাচ্ছে এটা নিয়েই তারা চিন্তিত।

সবাইকেই অন্যরকম লাগছিল। দিন শেষের সূর্যের আলো পড়েছে তাদের মুখে। বিশাল গ্রেটওয়াল দিগন্তে মিশে আছে, মনে হচ্ছে বিশাল এক নদী। দৃশ্যটা একই সঙ্গে সুন্দর এবং মন খারাপ করিয়ে দেবার মতো।

গ্রেটওয়ালের এক কোনায় দেখি, দানবের মতো সাইজের এক মঙ্গোলিয়ান ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার মালিক ইয়েনের বিনিময়ে দর্শনার্থীদের ঘোড়ায় চড়াচ্ছেন।

গ্রেটওয়াল দেখে যেমন মুগ্ধ হয়েছি ঘোড়া দেখে তেমন মুগ্ধ হলাম। যেন পাথরের তৈরি ভাস্কর্য। নিঃশ্বাসও ফেলছে না এমন অবস্থা। আমি এক ঘন্টার চুক্তি করে ঘোড়ায় চড়ে বসলাম। কমল ছুটে এসে বলল, এ-কী হুমায়ূন ভাই, ঘোড়ায় বসে আছেন কেন?

আমি বললাম, ঘোড়া আমার অতি পছন্দের একটি প্রাণী। নুহাশ পল্লীতে আমার দু'টা ঘোড়া ছিল।

সে বলল, সবাই গ্রেটওয়ালে ছোটাছুটি করছে, আর আপনি ঝিম ধরে ঘোড়ায় বসে আছেন, এটা কেমন কথা?

আমি নামলাম না। বসেই রইলাম। দুর্ধর্ষ মোঙ্গলরা ঘোড়ার পিঠে চড়ে যখন ছুটে যেত তখন তাদের কেমন লাগত ভাবতে চেষ্টা করলাম।

পাখি উড়ে চলে গেলে পাখির পালক পড়ে থাকে। মোঙ্গলরা নেই, তাদের ভগ্নস্বপ্ন পড়ে আছে।

টুরিস্টের চোখে

টুরিস্টদের দেশ ভ্রমণের কিছু নিয়ম আছে। তারা প্রতিটি দর্শনীয় জায়গায় যাবে। যা দেখবে তাতেই মুগ্ধ হবে। মুগ্ধ না হয়ে উপায় নেই, পয়সা উসুল করার ব্যাপার আছে। মুগ্ধ হওয়া মানে পয়সা উসুল হওয়া।

প্রতিটি দর্শনীয় স্থানে তারা কতক্ষণ থাকবে তারও নিয়ম আছে। ক্যামেরায় যতক্ষণ ফিল্ম আছে ততক্ষণ। ফিল্ম শেষ হওয়া মানে দেখা শেষ। আজকাল ডিজিটাল ক্যামেরা বের হয়ে নতুন যন্ত্রণা হয়েছে। এইসব ক্যামেরায় ফিল্ম লাগে না। যত ইচ্ছা ক্যামেরায় ক্লিক ক্লিক করে যাও।

আমরা বেইজিং-এর দর্শনীয় স্থান সবই দেখে ফেললাম।

কিউমিং লেকের পুরোটাই জমে বরফ। এর মধ্যেই ভেসে আছে অতি দামি মার্বেলে তৈরি বিশাল এক বজরা।

গ্রীষ্ম প্রাসাদ (Summer Palace)

UNESCO ১৯৯৮ সনে সামার প্যালেসকে World Heritage-এর লিস্টে স্থান দিয়েছে। গ্রীষ্ম প্রাসাদ দেখে সবাই মুগ্ধ। মুগ্ধ হবারই কথা। সম্রাটরা রাজকোষ ঢেলে দিয়েছেন নিজের গ্রীষ্ম প্রাসাদ বানাতে। সম্রাটরা গরমে কষ্ট করবেন তা কী করে হয়? গরমের সময় Kuming Lake-এর সুশীতল হাওয়া ভেসে আসে। কী শান্তি!

বিকেলে সম্রাট বা সম্রাট পত্নীর লেকের পাশে হাঁটতে ইচ্ছা হতে পারে। তার জন্যে তৈরি হলো হাঁটার পথ Long Corridor. অর্থের কী বিপুল অপচয়! সম্রাট পত্নী লেকের হাওয়া খাবেন। সহজ ব্যাপার না। সম্রাট পত্নীর কথা লিখলাম, কারণ গ্রীষ্ম প্রাসাদ সম্রাট পত্নী Dawager Cixi'র শখ মেটানোর জন্যে ১৮৬০ সনে বানানো হয়।

পাঠকরা কি অনুমান করতে পারবেন গ্রীষ্ম প্রাসাদের মূল অংশ কোনটা? মূল অংশ দীর্ঘজীবী ভবন। যেখানে সম্রাট এবং সম্রাট পত্নীর দীর্ঘজীবনের জন্য মন্ত্র পাঠ করতে হয়। দীর্ঘদিন বেঁচে না থাকলে কে ভোগ করবে? সম্রাটদের জীবনের মূল মন্ত্র তো একটাই— ভোগ।

গ্রীষ্ম প্রাসাদে আমার কাছে ভালো লেগেছে মার্বেলের বজরা। অতি দামি মার্বেলে বিশাল এক বজরা বানিয়ে পানিতে ভাসানোর বুদ্ধি কার মাথায় এসেছিল— এটা এখন আর জানা যাবে না। যার মাথায় এসেছিল, তার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতেই হয়।

আগেই বলেছি আমরা বেড়াতে গেছি শীতকালে। কিউমিং লেকের পুরোটাই তখন জমে বরফ। দেখে মনে হবে বরফের জমাট সমুদ্র। সেখানে ছেলেমেয়েরা মনের আনন্দে দৌড়াচ্ছে। শাওনের শখ হলো বরফের উপর

চীনা সম্রাটরা নিজেদের স্বর্গের পুত্র ভাবতেন। ধুলোমাটির পৃথিবীতে তাদের আসতে হয়েছে 'প্রজা' নামক একটা শ্রেণীর

জন্যে। স্বর্গের পুত্রেরা প্রার্থনা করতেন স্বর্গ মন্দিরে।

হাঁটবে। সে বলল, আমি জীবনে এই প্রথম লেক জমে বরফ হতে দেখলাম। এর উপর হাঁটব না! তাকে আটকালাম। সে বরফের লেকে নামলেই অন্যসব মেয়েরা নামবে। তাদের সঙ্গে বাচ্চারা নামবে এবং অবধারিতভাবে আছাড় খেয়ে কেউ না কেউ কোমর ভাঙবে। শাওন এবং স্বর্ণা দু'জনই সন্তানসম্ভবা। তাদের পেটের সন্তানরা মায়ের আছাড় খাওয়াকে ভালোভাবে নেবে— এরকম মনে করার কারণ নেই।

এদিকে অমিয় খুবই যন্ত্রণা শুরু করেছে। বানরের মতো বাবার গলা ধরে ঝুলে আছে তো আছেই। গলা ছাড়ছে না। উহুঁট উহুঁট আবদারও করছে। তার আবদারে আমরা সবাই মহাবিরক্ত, শুধু মাজহার খুশি। তার ধারণা এতে ছেলের বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পাচ্ছে। অমিয়'র উহুঁট আবদারের নমুনা দেই— পাথরের বজরা দেখে সে ঘোষণা করল, এই বজরায় চড়ে সে ঘুরবে। কাজটা এক্ষুনি করতে হবে।

মাজহার আনন্দিত গলায় আমাকে বলল, ছেলের বুদ্ধি দেখেছেন হুমায়ূন ভাই! পুরা বজরা পাথরের তৈরি, অথচ ছেলে দেখামাত্র বুঝে ফেলেছে এটা পানিতে ভাসে।

এক চায়নিজ শিশু আমাদের দেশের হাওয়াই মিঠাই টাইপ একটা খাবার খেতে খেতে যাচ্ছিল। হঠাৎ অমিয় ছোঁ মেরে তার হাত থেকে এটা নিয়ে নিজে খেতে শুরু করল। আমরা সবাই বিব্রত, শুধু মাজহারের মুখে গর্বের হাসি। মাজহার আমাকে বলল, আমার ছেলের অধিকার আদায়ের চেষ্টাটা দেখে ভালো লাগছে। সাহসী ছেলে। অন্য একজন খাচ্ছে, আমি কেন খাব না! এটাই তার Spirit. মাশাল্লাহ।

আমাদের দলে দু'টা শিশু। অতি দুষ্ট অমিয়, অতি শিষ্ট আরিয়ানা। মজার ব্যাপার হচ্ছে, পুরো চায়না ট্রিপে দেখেছি চায়নিজ তরুণীরা অমিয়কে নিয়ে মহাব্যস্ত। তারা আরিয়ানার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। কত মেয়েই না ছোঁ মেরে অমিয়কে কোলে তুলল! কত না আদর! চকলেট গিফট লজেন্স গিফট। অথচ পাশেই পরী শিশুর মতো আরিয়ানা মন খারাপ করে দাঁড়িয়ে।

মূল বিষয়টা পুরুষ সন্তানের প্রতি চায়নিজদের গভীর প্রীতি। আধুনিক চায়নায় একটির বেশি সন্তান নেয়া যাবে না। আইন কঠিন। সেই একটি সন্তান সবাই চায় পুত্র। কন্যা নয়। যাদের ভাগ্যে কন্যা জোটে, তারা কপাল চাপড়ায় এবং অন্যের পুত্রসন্তানদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে। দুঃখজনক পরিস্থিতি! এই পরিস্থিতি আরো খারাপের দিকে যাচ্ছে। আলট্রাসনোগ্রাফির কারণে গর্ভবতী মায়েরা আগেই জেনে যাচ্ছেন সন্তান ছেলে না মেয়ে। যখনই

জানছেন মেয়ে, গর্ভ নষ্ট করে ফেলছেন। পরের বার যদি পুত্র হয় তখন দেখা যাবে।

গর্ভ নষ্ট বিষয়ে কঠিন আইনকানুন না হলে এক সন্তানের দেশ মহান চীন আগামী একশ' বছরে নারীশূন্য হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

স্বর্গ মন্দির (Temple of Heaven)

চীনা সম্রাটরা নিজেদের স্বর্গের পুত্র ভাবতেন। ধুলোমাটির পৃথিবীতে তাদের আসতে হয়েছে 'প্রজা' নামক একটা শ্রেণীর দেখভালের জন্যে। স্বর্গের পুত্ররা প্রার্থনা করবেন, সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য হবে না এটা কেমন কথা?

স্বর্গ মন্দিরে ভালো ফসল যেন হয় তার জন্যে প্রার্থনা করা হতো। সমস্যা হচ্ছে, স্বর্গ পুত্র প্রার্থনা করছেন তারপরও প্রার্থনা গ্রাহ্য হচ্ছে না, ফসল নষ্ট হচ্ছে, দুর্ভিক্ষ হচ্ছে, এটা কেমন কথা!

স্বর্গ পুত্রদের কাছে এই কঠিন প্রশ্নেরও উত্তর আছে। প্রার্থনায় কোনো একটা ত্রুটি হয়েছে। নিয়মকানুন ঠিকমতো মানা হয় নি।

১৯৯৮ সালে UNESCO স্বর্গ মন্দিরকে World Heritage-এর আওতায় নিয়ে আসে। প্রসঙ্গক্রমে বলি, পাঠকরা কি জানেন বাংলাদেশের একটা জায়গা UNESCO'র World Heritage-এর লিস্টে আছে? যারা জানেন তারা তো জানেনই। যারা জানেন না তাদের জন্যে এটা একটা কুইজ।

হঠাৎ বাংলাদেশের প্রসঙ্গ কেন নিয়ে এলাম? স্বর্গ মন্দির, মিং রাজার কবরখানা নিয়ে তালো লাগছে না। একটা দেখলেই সব দেখা হয়ে গেল। সব প্রাসাদের একই ডিজাইন। একটাই বিশেষত্ব তার বিশালত্ব। সম্রাটরা কখনো ছোট কোনো চিন্তা করতে পারেন না। আমার প্রাসাদ হবে সবচে' বড়। দেখে যেন সবার পিলে চমকে যায়। চীনের ডায়ানেস্টিরা পিলে চমকানোর ব্যবস্থাই করেছেন। এর বেশি কিছু না।

রাজা-বাদশার ভোগ বিলাসের আয়োজন দেখে আমি মুগ্ধ হই না, এক ধরনের বিতৃষ্ণা অনুভব করি। এক যুগ আগে যখন চীনে প্রথম এসেছিলাম, তখন মিং সম্রাটের বালিশের মিউজিয়াম দেখেছিলাম। ঘুমুবার সময় তাঁর কয়টা বালিশ লাগত তার সংগ্রহ। এর মধ্যে পিরিচের সাইজের দু'টা গোলাকার বালিশ দেখে প্রশ্ন করেছিলাম— এই বালিশ দু'টা কেন?

গাইড বলল, সম্রাটের কানের লতি রাখার বালিশ।

আমি মনে মনে বললাম, মাশাল্লাহ! সম্রাটের কানের লতির গতি হোক। আমি এর মধ্যে নেই।

শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যাও

আমাদের নবী (স.)-র কথা। একজন মওলানা আমাকে বলেছিলেন— এই শিক্ষা ধর্ম শিক্ষা। অন্য কোনো শিক্ষা না। মাওলানাকে বলতে পারি নি যে, চীনে ইসলাম ধর্ম গিয়েছে নবীজির মৃত্যুর পর। ধর্ম শিক্ষার জন্যে চীনে যেতে হলে অন্য কোনো ধর্ম শিক্ষার জন্য যেতে হয়।

যাই হোক, প্রথমবার চীনে গিয়ে একটা মসজিদে গিয়েছিলাম। মসজিদের ভিজিটার্স বুক আছে। ভিজিটার্স বুকে নাম সই করতে গিয়ে দেখি, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হুসাইন মুহম্মদ এরশাদ সাহেবও এই মসজিদ দেখেছেন এবং সুন্দর সুন্দর কথা লিখেছেন।

মসজিদের ইমাম সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁর দু'টা নাম— একটা চায়নিজ নাম, অন্যটা মুসলমান নাম। যখন নামাজ পড়ান বা ধর্মকর্ম করেন, তখন চায়নিজ নাম ব্যবহার করেন।

ইসলাম ধর্মে জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্তি গড়ার অনুমতি নেই। কিন্তু চায়নিজ মসজিদের দেয়ালে এবং মসজিদের মাথায় ড্রাগন থাকবেই। চায়নিজ মুসলমানদের এই বিষয়ে ছাড় দেয়া হয়েছে কি-না জানি না।

নবীজি শিক্ষার জন্যে সুদূর চীনে যেতে বলেছিলেন। আমার ধারণা দূরত্ব বোঝানোর জন্যে তিনি চীনের নাম করেছেন। তবে আক্ষরিক অর্থে বলে থাকলেও চীনের উল্লেখ ঠিক আছে।

প্রাচীন চীন ছিল উদ্ভাবনের স্বর্গভূমি। কম্পাস চীনের আবিষ্কার। বারুদ, কাগজ, ছাপাখানা।

যখন এই লেখা লিখছি, তখন বিশ্বকাপ নিয়ে মাতামাতি হচ্ছে। কেউ কি জানে ফুটবল চীনাদের আবিষ্কার ? সং ডায়ানাস্টির সম্রাট টাইজু ফুটবল খেলছেন— এই তৈলচিত্রটি পাঠকদের দেখার জন্যে দেয়া হলো। ফুটবলের তখন নাম ছিল কু জু (Ku ju) অর্থ Kick ball.

আরো দুঃসংবাদ আছে। গলফও চাইনিজদের আবিষ্কার করা খেলা। গলফের নাম Chui Wan (মারের লাঠি), চুই ওয়ান খেলার আরেক নাম বু ডা (bu da)। এর অর্থ হাঁট এবং পেটাও।

এক হাজার বছর আগে চায়নিজ কবি ওয়াং জিয়ানের (টেং ডায়ানেস্টি) কবিতায় বু ডা খেলার যে বর্ণনা পাওয়া যায় তা আধুনিককালের গল্ফ।

দাবা চায়নিজদের আবিষ্কার করা খেলা। ভারতীয়রাও অবশ্যি এই খেলা আবিষ্কারের দাবিদার।

প্রথম ক্যালকুলেটার চায়নিজদের। নাম এ্যাবাকাস। হট এয়ার বেলুন, প্যারাসুট চায়নিজদের কীর্তি।

অঙ্কে ডেসিমেল সিস্টেম এখন সারা পৃথিবীতেই ব্যবহার করা হয়। কম্পিউটারে ব্যবহার করা হয় বাইনারি সিস্টেম। ডেসিমেল সিস্টেম এখন ডাল-ভাত, অথচ মানবজাতিকে দশভিত্তিক এই অঙ্কে আসতে শত বৎসর অপেক্ষা করতে হয়েছে। নিওলিথিক সময়ে (৬০০০ বছর আগে) এই ডেসিমেল সিস্টেম

প্রাচীন সিসমোগ্রাফ। এটি চীনাদের আবিষ্কার।

বিশ্বকাপ ফুটবল নিয়ে এখন বিশ্বজুড়ে মাতামাতি। এই খেলা চীনাদের আবিষ্কার। উপরের তৈলচিত্রে সং ডায়ানাস্টির সম্রাট টাইজু ফুটবল খেলছেন।

চায়নিজরা জানত এবং ব্যবহার করত। সাংহাই শহরে মাটি খুঁড়ে পাওয়া পটারিতে ১০, ২০, ৩০ এবং ৪০ সংখ্যার চিহ্ন পাওয়া গেছে, যা সেই সময়ের মানুষের ডেসিমেল সিস্টেমের জ্ঞানের কথাই বলে।

সংখ্যা	চিহ্ন
১০	❘
২০	U
৩০	ɯ
৪০	ɯ'

সিসমোগ্রাফ কাদের আবিষ্কার ? চায়নিজদের আবার কার ? প্রাচীন সিসমোগ্রাফের একটি ছবি পাঠকদের কৌতূহল মেটানোর জন্যে দেয়া হলো। এই আবিষ্কার করা হয় Han dynasty-র সময়ে।

এবার আসি ধাতু বিদ্যায়।

আকর থেকে লোহা এবং লোহা থেকে ইস্পাত চায়নিজদের আবিষ্কার। তামা এবং পরে ব্রোঞ্জও তাদের।

মাটির নিচ থেকে পেট্রোলিয়াম বের করা এবং ব্যবহার করার পদ্ধতিও তাদের আবিষ্কার। তারাই প্রথম খনি থেকে কয়লা তোলা শুরু করে।

ও সিল্কের কথা তো বলা হলো না। সিল্ক চায়নিজদের। চা চায়নিজদের। চা শব্দটাও কিন্তু চায়নিজ। চিনিও চাইনিজদের।

আমি আমার এই লেখার শিরোনাম দিয়েছি 'মহান চীন'। চীনকে মহান চীন বলছি চীনাদের এই আশ্চর্য উদ্ভাবনী ক্ষমতার জন্যে। চীন একটি বিশাল দেশ এই জন্যে না। চীনে গ্রেটওয়াল আছে এই জন্যেও না।

আমি লেখক মানুষ। বই ছাপা হয়। যে কাগজে লিখছি সেই কাগজ চায়নিজদের আবিষ্কার। যে ছাপাখানায় বই ছাপা হয়, সেই ছাপাখানাও তাদের আবিষ্কার। চীনকে মহান চীন না বলে উপায় আছে!

চীনে গিয়েছিলাম রাইটার্স ব্লক কাটাতে। সেই ব্লক কীভাবে কাটল সেটা বলে চীন ভ্রমণের উপর এলোমেলো ধরনের লেখাটা শেষ করি।

চীন ভ্রমণের শেষদিনের কথা। সবাই আনন্দ-উল্লাসে ঝলমল করছে। আজ শেষ মার্কেটিং। যে জিনিস আজ কেনা হবে না সেটা আর কোনোদিনও কেনা হবে না। ভোর আটটা বাজার আগেই সবাই তৈরি। আমি হঠাৎ বেঁকে বসলাম। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, আজ আমি কোথাও যাব না। (আমার একটা বইয়ের নাম।)

শাওন বলল, যাবে না মানে ?

আমি বললাম, যাব না মানে যাব না।

কেন ?

আমার ইচ্ছা।

কী করবে ? সারাদিন হোটেলে বসে থাকবে ?

হ্যাঁ।

তুমি হোটেলে বসে থাকার জন্যে এত টাকা খরচ করে চীনে এসেছ ?

হ্যাঁ।

তুমি কি জানো, তুমি না গেলে তোমার সফরসঙ্গীরা কেউ যাবে না ? সবাই যার যার ঘরে বসে থাকবে।

কেউ ঘরে বসে থাকবে না। সবাই যাবে। দুইশ ডলার বাজি।

আচ্ছা ঠিক আছে, সবাই যাবে। কিন্তু মন খারাপ করে যাবে। তুমি শেষ দিনে সবার মন খারাপ করিয়ে দিতে চাও ?

মাঝে মাঝে মন খারাপ হওয়া ভালো। এতে লিভার ফাংশন ঠিক থাকে।

তুমি না গেলে আমিও যাব না।

তুমি থাকতে পারবে না। হোটেলে আমি একা থাকব।

শাওনের গলা ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। তার দিকে তাকালেই চোখের পানি দেখা যাবে। আমি আবার চোখের পানির কাছে অসহায়। কাজেই তার দিকে না তাকিয়ে চোখ-মুখ কঠিন করে জানালার দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে প্রায় ছুটেই ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমি ব্যাগ খুলে কাগজ-কলম বের করলাম। লিখতে শুরু করলাম। আমার রাইটার্স ব্লক কেটে গেছে। কলমের মাথায় ঝর্নাধারার মতো শব্দের পর শব্দ আসছে। কী আনন্দ! কী আনন্দ! একসময় চোখে পানি এসে গেল। কিছুক্ষণ লেখার পর পাতা ঝাপসা হয়ে যায়। চোখ মুছে লিখতে শুরু করি।

কতক্ষণ লিখেছি জানি না। একসময় বিস্মিত হয়ে দেখি, শাওন আমার পেছনে। সে কি হোটেল থেকে যায় নি! সারাক্ষণ কি হোটেল ঘরেই ছিল? আমার কিছুই মনে নেই।

আমি লজ্জিত গলায় বললাম, হ্যালো।

সে বলল, তোমার রাইটার্স ব্লক কেটে গেছে, তাই না?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

সে বলল, আমি কী সুন্দর দৃশ্যই না দেখলাম! একজন লেখক কাঁদছে আর লিখছে। কাঁদছে আর লিখছে।

খুব সুন্দর দৃশ্য?

আমার জীবনে দেখা সবচে' সুন্দর দৃশ্য।

আমি বললাম, নিষিদ্ধ নগরীতে তুষারপাতের চেয়েও সুন্দর?

একশ' গুণ সুন্দর।

আমি অবাক হয়ে দেখি, তার চোখেও অশ্রু টলমল করছে।

চীন ভ্রমণে আমার অর্জন একজন মুগ্ধ তরুণীর আবেগ এবং ভালোবাসার শুদ্ধতম অশ্রু। মিং রাজাদের ভাগ্যে কখনো কি এই অশ্রু জুটেছে? আমার মনে হয় না।

প্রিয় পদরেখা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বয়স তখন মাত্র আঠারো। 'ভগ্নহৃদয়' নামে তাঁর একটি কবিতা ছাপা হয়েছে 'ভারতী' পত্রিকায়।

ত্রিপুরার মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের হৃদয় তখন সত্যিকার অর্থেই ভগ্ন। তাঁর স্ত্রী মহারাণী ভানুমতি মারা গেছেন। তিনি ভগ্নহৃদয় নিয়েই রবীন্দ্রনাথের 'ভগ্নহৃদয়' পড়লেন। পড়ে অভিভূত হলেন। একজন রাজদূত (রাধারমন ঘোষ) পাঠালেন কিশোর কবির কাছে। রাজদূত অতীব বিনয়ের সঙ্গে জানালেন, ত্রিপুরার মহারাজা আপনাকে কবিশ্রেষ্ঠ বলেছেন। কিশোর রবীন্দ্রনাথের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> এই লেখা বাহির হইবার কিছুকাল পরে কলিকাতায় ত্রিপুরার স্বর্গীয় মহারাজ বীরচন্দ্রমাণিক্যের মন্ত্রী আমার সহিত দেখা করিতে আসেন। কাব্যটি মহারাজের ভালো লাগিয়াছে এবং কবির সাহিত্যসাধনার সফলতা সম্বন্ধে তিনি উচ্চ আশা পোষণ করেন, কেবল এই কথাটি জানাইবার জন্যই তিনি তাঁহার অমাত্যকে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।
>
> [জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ]

মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য প্রতিভা চিনতে ভুল করেন নি। রবীন্দ্রনাথও বন্ধু চিনতে ভুল করেন নি। তিনি গভীর আগ্রহ এবং গভীর আনন্দ নিয়ে বারবার ত্রিপুরা গিয়েছেন। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্য এবং তাঁর পুত্র রাধাকিশোরমাণিক্যের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। কত না গান লিখেছেন ত্রিপুরায় বসে। যার একটি গানের সঙ্গে আমার বাল্যস্মৃতি জড়িত। আগে গানের কথাগুলি লিখি, তারপর বাল্যস্মৃতি।

ফাগুনের নবীন আনন্দে
গানখানি গাঁথিলাম ছন্দে ॥
দিল তারে বনবীথি,
কোকিলের কলগীতি,
ভরি দিল বকুলের গন্ধে ॥
মাধবীর মধুময় মন্ত্র
রঙে রঙে রাঙালো দিগন্ত।
বাণী মম নিল তুলি
পলাশের কলিগুলি,
বেঁধে দিল তব মণিবন্ধে ॥

রচনা : আগরতলা, ১২ই ফাল্গুন ১৩৩২
সূত্র : রবীন্দ্র সান্নিধ্যে ত্রিপুরা, বিকচ চৌধুরী

এখন এই গান-বিষয়ক আমার বাল্যস্মৃতির কথা বলি। আমরা তখন থাকি চট্টগ্রামের নালাপাড়ায়। পড়ি ক্লাস সিক্সে। আমার ছোটবোন সুফিয়াকে একজন গানের শিক্ষক গান শেখান। এই গানটি দিয়ে তার শুরু। আমার নিজের গান শেখার খুব শখ। গানের টিচার চলে যাবার পর আমি তালিম নেই আমার বোনের কাছে। সে আমাকে শিখিয়ে দিল হারমোনিয়ামের কোন রিডের পর কোন রিড চাপতে হবে। আমি যখন তখন যথেষ্ট আবেগের সঙ্গেই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গাই— 'ফাগুনের নবীন আনন্দে'।

একবার গান গাইছি, গানের শিক্ষক হঠাৎ উপস্থিত। আমার হারমোনিয়াম বাজানো এবং গান গাওয়া দেখে তাঁর ভুরু কুঁচকে গেল। তিনি কঠিন গলায় বললেন, খোকা শোন! তোমার গলায় সুর নেই। কানেও সুর নেই। রবীন্দ্রনাথের গান বেসুরে গাওয়া যায় না। তুমি আর কখনো হারমোনিয়ামে হাত দেবে না। অভিমানে আমার চোখে পানি এসে গেল।

আমি সেই শিক্ষকের আদেশ বাকি জীবন মেনে চলেছি। হারমোনিয়ামে হাত দেই নি। এখন বাসায় প্রায়ই শাওন হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে।

যন্ত্রটা হাত দিয়ে ধরতে ইচ্ছা করে। ধরি না। বালক বয়সের অভিমান হয়তো এখনো কাজ করে। তবে বাল্য-কৈশোর ও যৌবন পার হয়ে এসেছি বলেই হয়তো অভিমানের 'পাওয়ার' কিছুটা কমেছে। এখন ভাবছি কোনো একদিন গায়িকা শাওনকে বলব— তুমি আমাকে 'ফাগুনের নবীন আনন্দে' গানটা কীভাবে গাইতে হবে শিখিয়ে দেবে ?

যে ত্রিপুরা রবীন্দ্রনাথকে এত আকর্ষণ করেছে সেই ত্রিপুরা কেমন, দেখা উচিত না ? রবীন্দ্রনাথের পদরেখা আমার প্রিয় পদরেখা। সেই পদরেখা অনুসরণ করব না ? প্রায়ই ত্রিপুরা যেতে ইচ্ছা করে, যাওয়া হয় না, কারণ একটাই, ভ্রমণে আমার অনীহা। ঘরকুনো স্বভাব। আমার ঘরের কোনায় আনন্দ।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'প্রথম আলো' উপন্যাস পড়ে ত্রিপুরা যাবার ইচ্ছা আবারো প্রবল হলো। উপন্যাসের শুরুই হয়েছে ত্রিপুরা মহারাজার পুণ্যাহ উৎসবের বর্ণনায়। এমন সুন্দর বর্ণনা! চোখের সামনে সব ভেসে উঠে।

একবার ত্রিপুরা যাবার সব ব্যবস্থা করার পরেও শেষ মুহূর্তে বাতিল করে দিলাম। কেন করলাম এখন মনে নেই, তবে হঠাৎ করে ত্রিপুরা যাবার সিদ্ধান্ত কেন নিলাম সেটা মনে আছে। এক সকালের কথা, নুহাশ পল্লীর বাগানে চায়ের কাপ হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দৃষ্টি আটকে গেল। অবাক হয়ে দেখি, নীলমণি গাছে থোকায় থোকায় ফুল ফুটেছে। অর্কিডের মতো ফুল। হালকা নীল

জলপ্রাসাদ নীরমহল একোণে

উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত সঙ্গীরা

রঙ। যেন গাছের পাতায় জোছনা নেমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত, যেতে হবে ত্রিপুরা। কারণ নীলমণি লতা গাছ রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখেন ত্রিপুরায় মালঞ্চ নামের বাড়িতে। মালঞ্চ বাড়িটি রাজপরিবার রবীন্দ্রনাথকে উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন। বাড়ির চারদিকে নানান গাছ। একটা লতানো গাছে অদ্ভুত ফুল ফুটেছে। রবীন্দ্রনাথ গাছের নাম জানতে চান। স্থানীয় যে নাম তাঁকে বলা হয় তা তাঁর পছন্দ হয় না। তিনি গাছটার নাম দেন 'নীলমণি লতা'।

আমি আমার বন্ধুদের কাছে ত্রিপুরা যাবার বাসনা ব্যক্ত করলাম। তারা একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলল। বিরাট এক বাহিনী সঙ্গে যাবার জন্যে প্রস্তুত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগরসংগমে
তীর্থস্নান লাগি। সঙ্গীদল গেল জুটি
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দুটি
প্রস্তুত হইল ঘাটে।

আমরা অবশ্যি যাচ্ছি বাসে। সরকারি বাস। সরকার ঢাকা-আগরতলা বাস সার্ভিস চালু করেছেন। আরামদায়ক বিশাল বাস। এসির ঠাণ্ডা হাওয়া। সিটগুলি প্লেনের সিটের মতো নামিয়ে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়।

বাস আমাদের নিয়ে রওনা হয়েছে। বাংলাদেশ দেখতে দেখতে যাচ্ছি। কী সুন্দরই না লাগছে! যাত্রী বলতে আমরাই। বাইরের কেউ নেই। কাজেই গল্পগুজব হৈচৈ-এ বাধা নেই। দলের মধ্যে দুই শিশু। মাজহার পুত্র এবং কমল কন্যা। এই দুজন গলার সমস্ত জোর দিয়ে ক্রমাগত চিৎকার করছে। শিশুদের বাবা-মা'র কানে এই চিৎকার মধুবর্ষণ করলেও আমি অতিষ্ঠ। আমার চেয়ে তিনগুণ অতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক ইমদাদুল হক মিলন। সে একবার আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, মাজহারের এই বান্দর ছেলেটাকে থাপ্পড় দিয়ে চুপ করানো যায় না?

আমি বললাম, যায়। কিন্তু থাপ্পড়টা দেবে কে?

আমরা নিয়মিত সফরসঙ্গীদের সঙ্গে এবারই প্রথম মিলন যুক্ত হয়েছে। আরেকজন আছেন, আমার অনেক দিনের বন্ধু, প্রতীক প্রকাশনীর মালিক আলমগীর রহমান। তাঁর বিশাল বপু। বাসের দুটা সিট নিয়ে বসার পরেও তাঁর স্থান সংকুলান হচ্ছে না।

আলমগীর রহমান দেশের বাইরে যেতে একেবারেই পছন্দ করেন না। একটা ব্যতিক্রম আছে— নেপাল। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ মানেই প্লেনে করে কাঠমাণ্ডু চলে যাওয়া। নিজের শরীর পর্বতের মতো বলেই হয়তো পাহাড়-পর্বত

ত্রিপুরেশ্বর মন্দির

দেখতে তাঁর ভালো লাগে। তিনি আগরতলা যাচ্ছেন ভ্রমণের জন্যে না। কাজে। আগরতলায় বইমেলা হচ্ছে। সেখানে তাঁর স্টল আছে।

বাস যতই দেশের সীমানার কাছাকাছি যেতে লাগল ভ্রমণ ততই মজাদার হতে লাগল। রাস্তা সরু। সেই সরু রাস্তা কখনো কারোর বাড়ির আঙিনার উপর দিয়ে যাচ্ছে। কখনোবা বৈঠকখানা এবং মূলবাড়ির ভেতর দিয়ে যাচ্ছে। বিস্ময়কর ব্যাপার! রাস্তাঘাট না বানিয়েই আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু করে দেয়া একমাত্র বাংলাদেশের মতো বিস্ময়-রাষ্ট্রের পক্ষেই সম্ভব।

ত্রিপুরা সফরে পনের সদস্যের দলের দুই শিশুসদস্য অমিত্র ও আরিয়ানা

শুভেচ্ছা স্বাগতম

বাস বাংলাদেশ-ত্রিপুরার সীমান্তে থেমেছে। আমরা বাস থেকে নেমেছি এবং বিস্ময়ে থাবি খাচ্ছি। আমাদের আগমন নিয়ে ব্যানার শোভা পাচ্ছে। বিশাল বিশাল ব্যানার। আগরতলা থেকে কবি এবং লেখকরা ফুলের মালা নিয়ে এতদূর চলে এসেছেন। ক্যামেরার ফ্লাশলাইট জ্বলছে। ক্রমাগত ছবি উঠছে। সীমান্তের চেকপোস্টে বিশাল উৎসব।

অন্যদের কথা জানি না, আমি অভিভূত হয়ে গেলাম। প্রিয় পদরেখার সন্ধানে এসে এত ভালোবাসার মুখোমুখি হবো কে ভেবেছে! ফর্সা লম্বা অতি সুপুরুষ একজন, অনেক দিন অদর্শনের পর দেখা এমন ভঙ্গিতে, আমাকে জড়িয়ে ধরে আছেন। কিছুতেই ছাড়ছেন না। ভদ্রলোকের নাম রাতুল দেববর্মন। তিনি একজন কবি। মহারাজা বীরচন্দ্রমাণিক্যের বংশধর। কিংবদন্তি গায়ক শচীন দেববর্মন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত। তাঁকে আমি এই প্রথম দেখছি।

সীমান্তের চেকপোস্টে আরো অনেকেই এসেছিলেন, সবার নাম এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না। যাদের নাম মনে পড়ছে তারা হলেন *দৈনিক ত্রিপুরা দর্পণ* পত্রিকার সম্পাদক সমীরণ রায়, পদ্মা-গোমতী আগরতলা-র সাধারণ সম্পাদক শুভাশিস তলাপাত্র, আগরতলা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দাশ, অধ্যাপক কাশীনাথ রায়, রবীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রমুখ। শুভেচ্ছার বাণী নিয়ে এগিয়ে নিতে আসা এইসব আন্তরিক মানুষ আমাদের ফিরে যাবার দিনও এক কাণ্ড করলেন। তাঁরা গম্ভীর ভঙ্গিতে বললেন, আপনারা আজ যেতে পারবেন না। আমরা আপনাদের আরো কিছুদিন রাখব।

তখন আমরা পুঁটলাপুঁটলি নিয়ে বাসে উঠে বসেছি। এক্ষুনি বাস ছাড়বে।

তাঁরা বললেন, আমরা বাসের সামনে শুয়ে থাকব, দেখি আপনারা কীভাবে যান।

টুরিস্ট, না লেখক?

কবি-লেখকদের সম্মিলিত হৈচৈয়ের ভেতর পড়ব এমন চিন্তা আমার মনেও ছিল না। আমার কল্পনায় ছিল বন্ধুবান্ধব নিয়ে টুরিস্টের চোখে রবীন্দ্রনাথের প্রিয়ভূমি দেখব। সেটা সম্ভব হলো না। আমাকে নিয়ে তাদের আগ্রহ দেখেও কিছুটা বিব্রত এবং বিচলিত বোধ করলাম। এত পরিচিতি ত্রিপুরায় আমার থাকার কথা না। বাংলাদেশের গল্প-উপন্যাস ত্রিপুরায় খুব যে পাওয়া যায় তাও না। টিভি চ্যানেলগুলি দেখা যায়। আমার পরিচিতির সেটা কি একটা কারণ হতে পারে?

অনেক বছর ধরে *দেশ* পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস লিখি, সেটা কি একটা কারণ ? হিসাব মিলাতে পারছি না।

প্রথম রাতেই যেতে হলো বইমেলায়। ভেবেছিলাম ছোট্ট ঘরোয়া ধরনের বইমেলা। গিয়ে দেখি হুলস্থূল আয়োজন। বিশাল জায়গা নিয়ে উৎসব মুখরিত অঙ্গন। দেখেই মন ভালো হয়ে গেল। প্রতিটি দোকান সাজানো, সুশৃঙ্খল দর্শকের সারি। মেলার বাইরে বড় বড় ব্যানারে কবি-লেখকদের রচনার উদ্ধৃতি। বাংলাদেশের কবি নির্মলেন্দু গুণের কবিতা দেখে খুবই ভালো লাগল। বাংলাদেশ থেকে একমাত্র তাঁর উদ্ধৃতিই স্থান পেয়েছে।

কবি গুণ আমার পছন্দের মানুষ। আমি তাঁর কবিতার চেয়েও গদ্যের ভক্ত। আমার ধারণা তাঁর জন্ম হয়েছিল গদ্যকার হিসেবে। অল্প বয়সেই চুল-দাড়ি লম্বা করে ফেলায় কবি হয়েছেন। যতই দিন যাচ্ছে নির্মলেন্দু গুণের চেহারা যে রবীন্দ্রনাথের মতো হয়ে যাচ্ছে— এই ব্যাপারটা কি আপনারা লক্ষ করছেন ? খুবই চিন্তার বিষয়।

আমি মেলায় ঘুরছি, আগরতলার লেখকরা গভীর আগ্রহে আমাকে তাদের লেখা বইপত্র উপহার দিচ্ছেন। নিজেকে অপরাধী অপরাধী লাগছে। কারণ এই যে গাদাখানিক বই নিয়ে দেশে যাব, আমি কি বইগুলি পড়ার সময় পাব ? বই

এই জলপথ পাড়ি দিয়েই যেতে হবে জলপ্রাসাদ নীরমহলে

এমন বিষয় ভেতর থেকে আগ্রহ তৈরি না হলে পড়া যায় না। জোর করে বই পড়া অতি কষ্টকর ব্যাপার। আমি বই পড়ি আনন্দের জন্যে। যে বইয়ের প্রথম পাঁচটি পাতা আমাকে আনন্দ দিতে পারে না, সেই বই আমি পড়ি না।

আগরতলার লেখকদের যে সব বই পেলাম, তার সিংহভাগ কবিতার। বাঙলা ভাষাভাষিরা কবিতা লিখতে এবং কবিতার বই প্রকাশ করতে পছন্দ করেন। প্রতিবছর ঢাকায় জাতীয় কবিতা সম্মেলন হয়। এই উপলক্ষে কত কবিতার বই যে বের হয়! শুনেছি গত কবিতা সম্মেলনে বাংলাদেশের পাঁচ হাজার কবি রেজিস্ট্রেশন করেছেন। কবির সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই ব্যবস্থা। নাম রেজিস্ট্রি করে রেজিস্ট্রেশন নম্বর নিতে হয়।

কবিতা প্রসঙ্গ এইখানেই শেষ। কবিরা আমার উপর রাগ করতে পারেন। একটাই ভরসা, এই রচনা কোনো কবি পাঠ করবেন না। কবিরা গদ্য পাঠ করেন না।

উদয়পুর

বইমেলার সামনে বড়সড় একটা বাস দাঁড়িয়ে। এই বাসে করে আমরা যাব ত্রিপুরা থেকে সত্তুর কিলোমিটার দূরে উদয়পুর। বাসের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন 'ত্রিপুরা দর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক সমীরন বাবু। আমাদের সঙ্গে গাইড হিসেবে

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে জলখিয়ো অন্নপ্রাশন উৎসব

যাচ্ছেন কবি রাতুল দেববর্মণ। আনন্দ এবং উত্তেজনায় তিনি স্থির হয়ে এক জায়গায় বসে থাকতেও পারছেন না। ক্রমাগত সিট বদলাচ্ছেন।

বাস ছাড়বে ছাড়বে করছে— এই সময় রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস চ্যান্সেলর দিলীপ চক্রবর্তী উপস্থিত হলেন। মুখে ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। অতি সুদর্শন মানুষ। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো গৌর। তিনি যখন জানলেন, বাংলাদেশ থেকে লেখকদের দল যাচ্ছে উদয়পুর— তিনি লাফ দিয়ে বাসে উঠে পড়লেন। আমাদের সফরের বাকি দিনগুলি তিনি আমাদের সঙ্গেই ছিলেন। নিজের ঘরসংসার বাদ।

আমরা আগ্রহ নিয়ে উদয়পুরের ভুবনেশ্বর মন্দির দেখতে গেলাম। এই মন্দিরে নরবলি হতো। রবীন্দ্রনাথ 'রাজর্ষি' লিখলেন এই মন্দির দেখে। পরে রাজর্ষিকে নিয়ে বিখ্যাত 'বিসর্জন' নাটকটি লেখা হলো। সবাই আগ্রহ নিয়ে ভুবনেশ্বর মন্দির দেখছে। ছবি তুলছে। আমি খটকা নিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছি। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পড়ে আমি যতটুকু জানি— 'রাজর্ষি' লেখার সময় রবীন্দ্রনাথ ত্রিপুরায় যান নি। অনেক পরে গেছেন। 'রাজর্ষি'র কাহিনী রবীন্দ্রনাথ পেয়েছিলেন স্বপ্নে। তিনি ফিরছেন দেওঘর থেকে। সারারাত ঘুম হয় নি। হঠাৎ ঝিমুনির মতো হলো। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> কোন্‌-এক মন্দিরের সিঁড়ির উপর বলির রক্তচিহ্ন দেখিয়া একটি বালিকা অত্যন্ত করুণ ব্যাকুলতার সঙ্গে তাহার বাপকে জিজ্ঞাসা করিতেছে, 'বাবা এ কী! এ-যে রক্ত!' বালিকার এই কাতরতায় তাহার বাপ অন্তরে ব্যথিত হইয়া অথচ বাহিরে রাগের ভান করিয়া কোনোমতে তার প্রশ্নটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করিতেছে। —জাগিয়া উঠিয়াই মনে হইল, এটি আমার স্বপ্নলব্ধ গল্প। এমন স্বপ্নে-পাওয়া গল্প এবং অন্য লেখা আমার আরো আছে। এই স্বপ্নটির সঙ্গে ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্যের পুরাবৃত্ত মিশাইয়া রাজর্ষি গল্প মাসে মাসে লিখিতে লিখিতে বালকে বাহির করিতে লাগিলাম।
>
> [জীবনস্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ]

ভুবনেশ্বর মন্দির দর্শনের পর গেলাম ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দেখতে। আমি ছোটখাটো মন্দির দেখে আনন্দ পাচ্ছিলাম না। ভারতবর্ষ মন্দিরের দেশ। এমন সব মন্দির সারা ভারতে ছড়ানো যা দেখতে পাওয়া বিরাট অভিজ্ঞতা। সেই তুলনায় উদয়পুরের মন্দিরগুলি তেমন কিছু না।

ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরের একটা বিষয় আমার সফরসঙ্গীদের, বিশেষ করে মহিলাদের, খুব আকর্ষণ করল। সেখানে একটা বাচ্চার অন্নপ্রাশন উৎসব হচ্ছিল। বর্ণাঢ্য উৎসব। তারা উৎসবের সঙ্গে মিশে গেল। পুরোহিতের অনুমতি নিয়ে নিজেরাই আনন্দঘণ্টা বাজাতে লাগল।

উৎসবের মধ্যেই জানা গেল, পাশেই ইচ্ছাপূরণ দিঘি বলে এক দিঘি। দিঘি ভর্তি মাছ। মাছকে খাবার খাওয়ালে তাদের গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলে মনের ইচ্ছা পূরণ হয়। মেয়েরা অন্নপ্রাশন উৎসব ছেড়ে রওনা হলো ইচ্ছাপূরণ দিঘির দিকে।

এই অঞ্চলেই নাকি ভারতবর্ষের সবচে' ভালো প্যারা পাওয়া যায়। দু'শ' বছর ধরে মিষ্টির কারিগররা এই প্যারা বানাচ্ছেন। আমি গেলাম প্যারা কিনতে। ভারতবর্ষের মন্দিরগুলির সঙ্গে প্যারার কি কোনো সম্পর্ক আছে? যেখানেই মন্দির সেখানেই প্যারা। দেবতাদের ভোগ হিসেবে মিষ্টান্ন দেওয়া হয়। প্যারা কি দেবতাদের পছন্দের মিষ্টান্ন?

প্যারার একটা টুকরো ভেঙে মুখে দিলাম— যেমন গন্ধ তেমন স্বাদ। আমাদের মধ্যে প্যারা কেনার ধুম পড়ে গেল।

আমি কবি রাতুলকে প্রশ্ন করলাম, আপনার কি ধারণা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানকার প্যারা খেয়েছেন?

রাতুল প্রশ্নের জবাব দিতে পারলেন না। আমার নিজের ধারণা খেয়েছেন। ভালো জিনিসের স্বাদ তিনি গ্রহণ করবেন না তা হয় না। যদিও তাঁর সমগ্র রচনায় তিনি শারীরিক আনন্দের বিষয়টিকে তেমন গুরুত্ব দেন নি। তাঁর রচনায় মানসিক আনন্দের বিষয়টিই প্রধান। শরীর গৌণ। তাঁর বিপুল সাহিত্যকর্মে যৌনতার বিষয়টি অনুপস্থিত বললেই হয়। হৈমন্তী গল্পে একবার লিখলেন— 'তখন তাহার শরীর জাগিয়া উঠিল।' এই পর্যন্ত লিখেই চুপ। তাঁর কাছে দেহ মনের আশ্রয় ছাড়া কিছু না। নারীদেহের দিকে তাকালে পুরুষদের নানা সমস্যা হয়। রবীন্দ্রনাথের সমস্যা অন্যরকম—

ওই দেহ-পানে চেয়ে পড়ে মোর মনে
যেন কত শত পূর্বজনমের স্মৃতি।
সহস্র হারানো সুখ আছে ও নয়নে,
জন্মজন্মান্তের যেন বসন্তের গীতি।

[স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

কালো বুদ্ধিজীবী

বুদ্ধিজীবীরা শাদা-কালো হন না। তাদের জীবিকা বুদ্ধি। বুদ্ধি বর্ণহীন। তবে আমাদের ভ্রমণের একজন প্রধান সঙ্গী জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক শফি আহমেদকে আমি 'কালো বুদ্ধিজীবী' ডেকে আনন্দ পাই।

চিল আকাশে উড়ে, তার দৃষ্টি থাকে স্থলে। শফি আহমেদ বাংলাদেশে বাস করেন, কিন্তু তাঁর হৃদয় পড়ে থাকে আগরতলায়। আগরতলার প্রতিটি গাছ, প্রতিটি পাথর তিনি চেনেন। আগরতলা সম্পর্কে কেউ সামান্যতম মন্দ কথা বললে তিনি সার্টের হাতা গুটিয়ে মারতে যান।

এই সদানন্দ চিরকুমার মানুষটি আমাকে মুক্তিযুদ্ধের সময় আগরতলার মহান ভূমিকার কথা কী সুন্দর করেই না বললেন! মুক্তিযোদ্ধারা কোথায় থাকত, কোথায় ছিল ফিল্ড হাসপাতাল, সব ঘুরে ঘুরে দেখালেন।

বেড়াতে গেলে আমি কখনো ইউনিভার্সিটি বা কলেজ দেখতে যাই না। কালো বুদ্ধিজীবী আমাকে জোর করে নিয়ে গেলেন আগরতলার এমবিবি কলেজে। কারণ কী? কারণ একটাই, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই কলেজের একটা ভূমিকা আছে। কলেজটা ছিল শরণার্থী শিবির। কাজেই আমাকে দেখতে হবে।

শুনতে পাচ্ছি শফি আহমেদ সাহেব বলেছেন, মৃত্যুর পর তাঁর কবর যেন হয় আগরতলায়। শফি সাহেবের বন্ধুবান্ধবরা চিন্তিত। ডেডবডি নিয়ে এতদূর যাওয়া সহজ ব্যাপার না।

চখাচখি

আমাদের এবারের ভ্রমণ চখাচখি ভ্রমণ। সবাই জোড়ায় জোড়ায় এসেছে। দেশের বাইরে পা দিলে চখাচখি ভাবের বৃদ্ধি ঘটে। আমাদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে। স্ত্রীরা স্বামীদের নিয়ে নানান আহ্লাদী করছে। স্বামীরা প্রতিটি আহ্লাদীকে গুরুত্ব দিচ্ছে। খুবই চেষ্টা করছে প্রেমপূর্ণ নয়নে স্ত্রীর দিকে

শাওন এবং জনৈক ওপন্যাসিক

তাকাতে। মিষ্টি মিষ্টি কথা বলতে। মাজহার এবং কমল দু'জনকেই দেখলাম স্ত্রীর মুখে তুলে প্যারা খাওয়াচ্ছে। তারাও এমন ভাব করছে যেন সারাজীবন তারা এভাবেই মিষ্টি খেয়ে এসেছে। এটা নতুন কিছু না।

চখাচখিদের মধ্যমণি অন্যদিন পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক নাসের এবং নাসের-পত্নী তামান্না। এটা তাদের হানিমুন ট্রিপ। কিছুদিন আগেই বিয়ে হয়েছে। তামান্নার হাতের মেহেদির দাগ তখনো ম্লান হয় নি।

আমরা কত না জায়গায় ঘুরলাম, কত কিছু দেখলাম, এই দু'জন কিছুই দেখল না। দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইল।

চখাচখি গ্রুপ থেকে বাদ পড়েছে মিলন ও আলমগীর রহমান। তারা স্ত্রীদের দেশে ফেলে গেছে। সবাই জোড়া বেঁধে ঘুরছে, মিলন-আলমগীরও জোড়া বেঁধে ঘুরছে। দু'জনের মুখই গম্ভীর। দু'জনই দু'জনের উপর মহাবিরক্ত। ভদ্রতার খাতিরে কেউ বিরক্তি প্রকাশ করতে পারছে না। মজার ব্যাপার।

সবচে' আনন্দ লাগল আর্কিটেক্ট করিম এবং তার স্ত্রী স্নিগ্ধাকে দেখে। স্নিগ্ধা সারাক্ষণ স্বামীর হাত ধরে আছে। করিমের অতি সাধারণ রসিকতায় হেসে ভেঙে পড়ছে এবং রাগ করে বলছে, তুমি এত হাসাও কেন? ছিঃ! দুষ্টু!

করিমের গানের গলা ভালো। যে-কোনো বাংলা এবং হিন্দি গানের প্রথম চার লাইন সে শুদ্ধ সুরে গাইতে পারে। করিম তার এই ক্ষমতাও কাজে লাগাচ্ছে, স্নিগ্ধার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে গানে।

শাওন একসময় আমাকে বলল, দেখ করিম চাচা স্ত্রীকে নিয়ে কত আনন্দ করছেন, আর তুমি গম্ভীর হয়ে বসে আছ!

আমি করিমকে ডেকে বললাম, তুমি শাওনের অভিযোগের উত্তর গানে গানে দাও।

করিম সঙ্গে সঙ্গে গাইল—

সখী, বহে গেল বেলা, শুধু হাসিখেলা,
এ কি আর ভালো লাগে?

বেদনার সঙ্গে জানাচ্ছি, আগরতলার আনন্দময় ভ্রমণ শেষ করেই স্নিগ্ধা তার স্বামী এবং একমাত্র শিশুপুত্র রিসাদকে ফেলে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করে।

জগতের সর্বপ্রাণী সুখী হোক।

নীরমহল

ত্রিপুরার মহারাজ (খুব সম্ভব মহারাজা বীর বিক্রম বাহাদুর) তাঁর স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্যে স্ত্রীর দেশের রাজপ্রাসাদের অনুকরণে বিশাল এক জলপ্রাসাদ বানিয়েছিলেন। জলপ্রাসাদ, কারণ প্রাসাদটা জলের মাঝখানে। দিগন্তবিস্তৃত জলরাশির মাঝখানে এক রাজবাড়ি। নাম নীরমহল। জলে যার ছায়া পড়ে। যেমন কল্পনা তেমন রূপ। UNESCO মনে হয় এর খোঁজ এখনো পায় নি। খোঁজ পেলে World Heritage-এর আওতায় অবশ্যই নিয়ে আসত।

আমরা একটি আনন্দময় রাত কাটালাম দূর থেকে নীরমহলের দিকে তাকিয়ে। আমাদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল এমন একটা রেস্টহাউসে, যেখান থেকে জলপ্রাসাদ নীরমহল দেখা যায়।

রাত অনেক হয়েছে, আমরা গোল হয়ে রেস্টহাউসের বারান্দায় বসে আছি। তাকিয়ে আছি নীরমহলের দিকে। চট করে রবীন্দ্রনাথের লাইন মনে হলো—

রাজশক্তি বজ্রসুকঠিন
সন্ধ্যারক্তরাগসম তন্দ্রাতলে হয় হোক লীন,
কেবল একটি দীর্ঘশ্বাস
নিত্য-উচ্ছ্বসিত হয়ে সকরুণ করুক আকাশ,
এই তব মনে ছিল আশ।

রাতের অন্ধকারে বর্ণিল আলোয় সেজে ওঠে জলপ্রাসাদ নীরমহল

কেন জানি মনটাই খারাপ হলো। আমি শাওনের দিকে ফিরে বললাম, গান শোনাও তো। একের পর এক রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে যাবে। Stop না বলা পর্যন্ত থামবে না।

রেস্টহাউসের সব বাতি নেভানো। আমাদের দৃষ্টি দূরের নীরমহলের দিকে। গায়িকার কিন্নর কণ্ঠ বাতাসে মিশে মিশে যাচ্ছে। সে গাইছে— 'সখী, বহে গেল বেলা।'

বিলায় নীরমহল

আমি মনে মনে বললাম, জলরাশির মাঝখানে অপূর্ব নীরমহল দেখার জন্যে আমি ত্রিপুরায় আসি নি। আমি এসেছি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় পদরেখার সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আপনি আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা গ্রহণ করুন। আমার গলায় সুর নেই। আপনার অপূর্ব সঙ্গীত আমি কোনোদিনই কণ্ঠে নিতে পারব না। আমার হয়ে আপনার গান আপনাকে পাঠাচ্ছে আমার স্ত্রী শাওন। কী সুন্দর করেই সে গাইছে— তাই-না কবি ?

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভগ্নহৃদয়'-এর কিছু অংশ

ভগ্নহৃদয়

প্রথম সর্গ

দৃশ্য— বন। চপলা ও মুরলা

চপলা। সখি, তুই হলি কি আপনা-হারা ?
এ ভীষণ বনে পশি একেলা আছিস্ বসি
খুঁজে খুঁজে হোয়েছি যে সারা!
এমন আঁধার ঠাঁই— জনপ্রাণী কেহ নাই,
জটিল-মস্তক বট চারি দিকে ঝুঁকি!
দুয়েকটি রবিকর সাহসে করিয়া ভর
অতি সন্তর্পণে যেন মারিতেছে উঁকি।
অন্ধকার, চারি দিক হ'তে, মুখপানে
এমন তাকায়ে রয়, বুকে বড় লাগে ভয়,
কি সাহসে রোয়েছিস বসিয়া এখানে ?

মুরলা। সখি, বড় ভালবাসি এই ঠাঁই!
বায়ু বহে হুহু করি, পাতা কাঁপে ঝর ঝরি,
স্রোতস্বিনী কুলু কুলু করিছে সদাই!
বিছায়ে শুকানো পাতা বটমূলে রাখি মাথা
দিনরাত্রি পারি, সখি, শুনিতে ও ধ্বনি।
বুকের ভিতরে গিয়া কি যে উঠে উথলিয়া
বুঝায়ে বলিতে তাহা পারি না সজনি!
যা সখি, একটু মোরে রেখে দে একেলা,
এ বন আঁধার ঘোর ভাল লাগিবে না তোর,
তুই কুঞ্জবনে, সখি, কর্ গিয়ে খেলা!

চপলা। মনে আছে, অনিলের ফুলশয্যা আজ ?
তুই হেথা বোসে র'বি, কত আছে কাজ!
কত ভোরে উঠে বনে গেছি ছুটে,
মাধবীরে লোয়ে ডাকি,

ডালে ডালে যত ফুল ছিল ফুটে
একটি রাখি নি বাকি।
শিশিরে ভিজিয়ে গিয়েছে আঁচল,
কুসুমরেণুতে মাখা।
কাঁটা বিঁধে, সখি, হোয়েছিনু সারা
নোয়াতে গোলাপ-শাখা।
তুলেছি করবী গোলাপ-গরবী,
তুলেছি টগরগুলি,
যুঁইকুঁড়ি যত বিকেলে ফুটিবে
তখন আনিব তুলি।
আয়, সখি, আয়, ঘরে ফিরে আয়,
অনিলে দেখ্‌সে আজ—
হরষের হাসি অধরে ধরে না,
কিছু যদি আছে লাজ!

মুরলা। আহা সখি, বড় তারা ভালবাসে দুই জনে!

স্বর্গ, না অন্যকিছু ?

কোথায় যাচ্ছি ?
সুইজারল্যান্ড।
কেন যাচ্ছি ?
খেলতে।
কী খেলা ?
নাটক নাটক খেলা।

পাঠকরা নিশ্চয়ই ধাঁধায় পড়ে গেছেন। ধাঁধা ভেঙে দিচ্ছি। আমি নাটকের এক দল নিয়ে যাচ্ছি সুইজারল্যান্ড। এই উর্বর বুদ্ধি আমার মাথা থেকে আসে নি। এত বুদ্ধি আমার নেই।

আমি (স্বল্পবুদ্ধির কারণেই হয়তো) মনে করি না টিভি নাটক করার জন্যে দেশের বাইরে যেতে হবে। বাংলাদেশে সুন্দর জায়গার অভাব পড়ে নি। পাহাড় আছে, সমুদ্র আছে, হাওর আছে, বন-জঙ্গল আছে, চা-বাগান আছে, রাবার বাগান আছে। মরুভূমি অবশ্যি নেই। ক্যামেরার সামান্য কারসাজিতে পঞ্চার ধু-ধু বালির চরকে মরুভূমি দেখানো জটিল কিছু না, কয়েকটা উট ছেড়ে দিতে হবে। বাংলাদেশে এখন উটও পাওয়া যায়।

তাছাড়া টিভি নাটকে প্রকৃতি দেখানোর তেমন সুযোগ কোথায় ? টিভি নাটকে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক দেখানো হয়। প্রকৃতি সেখানে গৌণ। টিভি পর্দায় Depth of field আসে না বলে প্রকৃতির অতি মনোরম দৃশ্যও মনে হয় Two dimensional. সাদাকথায় ফ্ল্যাট।

তাহলে আমি সুইজারল্যান্ড কেন যাচ্ছি ? আমার এক প্রাক্তন ছাত্রের কথার জাদুতে বিভ্রান্ত হয়ে। ছাত্রের নাম হাসান। সে চ্যানেল আই-এর কর্তাব্যক্তিদের একজন। এইচআরডি নামক দামি এক জিপে করে গম্ভীর ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়ায়।

আমি যখন শহীদুল্লাহ হলের হাউস টিউটর সে ঐ হলের ছাত্র। হৃদয়ঘটিত কোনো এক সমস্যায় জর্জরিত। অর্থনৈতিকভাবেও পর্যুদস্ত। এমন সময়ে সে আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। তার আবদার— এমন কিছু যেন বলি যাতে তার মন শান্ত হয়। আমি তাকে কী বলেছিলাম তা এখন আর তার মনে নেই। তবে হাসানের মন শান্ত হয়েছিল— এই খবর সে আমাকে দিয়েছে।

সেই হাসান সুইজারল্যান্ডের কথা বলে আমাকে প্রায় কাবু করে ফেলল।

স্যার, ভূস্বর্গ! আপনি ভূস্বর্গ দেখবেন না ? রথ দেখবেন এবং কলা বেচবেন। নাটকও হলো, ভূস্বর্গও দেখা হলো।

বিদেশে নাটক করার নতুন হুজুগ ইদানীং শুরু হয়েছে। একজন নায়ক এবং একজন নায়িকা যান। তারা সুন্দর সুন্দর জায়গায় যান। প্রেম করেন। গান করেন। স্থানীয় কিছু ছেলেমেয়ে আনা হয়। তারা যেহেতু কখনো ক্যামেরার সামনে আসে নি তারা রোবটের মতো আসে। চোখ-কান বন্ধ করে দু'একটা সংলাপ কোনোমতে বলে।

এ ধরনের নাটক করা তো আমার পক্ষে সম্ভব না। নায়ক-নায়িকা নির্ভর নাটক আমি লিখতেও পারি না। হাসানকে এই কথা বলতেই সে বলল, আপনার যে ক'জনকে নিতে হয় নেবেন। কোনো সমস্যা নেই। দশজন নিলে দশজন। পনেরোজন নিলে পনেরোজন।

আমি আশ্চর্যই হলাম। হাসান বলল, বিশাল দু'টা বাড়ি আমি আপনাদের জন্যে এক মাসের জন্যে ভাড়া করেছি। বাড়িতে থাকবেন। নিজের মতো রান্না করে খাবেন। একজন বাবুর্চিকেও অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছে।

হাসানের কর্মকাণ্ডে আমি মুগ্ধ। তারপরেও মন টানছে না। কেন জানি বাইরে যেতে ইচ্ছা করে না। নিজের দেশের ঘরের এক কোণে সারাদিন বসে থাকতেও ভালো লাগে। হাসানকে না করে দিলাম। ইতিমধ্যে সুইজারল্যান্ডে নাটক বানানোর প্রস্তাব প্রকাশ হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে যারা কাজ করে

তাদের খুব আগ্রহ যেন আমি রাজি হই।

রাজি হলাম। হাসানের হাতে শিল্পীদের একটা তালিকা ধরিয়ে দিয়ে বললাম, এদের সবাইকে যদি নিয়ে যেতে পারি তাহলে O.K.

হাসান বলল, আরো নিতে পারেন। আমি তো বলেছি কতজনকে নেবেন আপনার ব্যাপার।

আমি আবারো চমৎকৃত হলাম। তালিকাটা যথেষ্টই বড়।

রিয়াজ, শাওন, চ্যানেলার, স্বাধীন খসরু, ডাক্তার এজাজ, ফারুক আহমেদ, টুটুল, তানিয়া।

আমাকে নিয়ে নয়জন। হাসান নিমিষের মধ্যে তিসা করিয়ে ফেলল। যথাসময়ে বিমানে উঠলাম। ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক আহমেদের এই প্রথম দেশের বাইরে যাত্রা। তাদের আনন্দ এবং উত্তেজনা দেখে ভালো লাগল। তারা শপিং শুরু করল ঢাকা এয়ারপোর্ট থেকে। এটা দেখেও ভালো লাগল। রিয়াজ অবশ্যি যেতে পারল না। শেষমুহূর্তে তার জরুরি কাজ পড়ে গেল। ব্যস্ত নায়করা শেষমুহূর্তে জরুরি কাজ বের করে মূল পরিকল্পনা বানচাল করে ফেলেন। আমি এই 'শেষমুহূর্ত' নিয়ে প্রস্তুত ছিলাম বলে তেমন সমস্যা হলো না।

আমি লক্ষ করেছি, ঢাকা শহরে খুব দামি গাড়ি চড়ে যারা ঘুরে তারা খোলামেলা কথা বলতে পারে না। দরজা-জানালা বন্ধ এসি গাড়িতে থাকার কারণেই মনে হয় এটা হয়।

হাসানের কাছে শুনেছিলাম একটা বিশাল বাড়ি ভাড়া করা হয়েছে, বাস্তবে দেখা গেল শাহীন নামে সুইজারল্যান্ড প্রবাসী এক ছেলে তার ফ্ল্যাটের দু'টা কামরা ছেড়ে দিয়েছে। একজন বাবুর্চি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়া হয়েছিল বলে শুনেছিলাম, দেখা গেল বাবুর্চি আমাদের হাসান। সে উৎসাহের সঙ্গে জানালো যে, ডাল রান্নায় তার নৈপুণ্য অসাধারণ। তিনদিনের ডাল রেঁধে সে না-কি ডিপ ফ্রিজে রেখেও দিয়েছে।

ব্যবস্থা দেখে আমার প্রায় স্ট্রোক হবার জোগাড় হলো। আমি খুবই গরিবের ছেলে। গরিবের ছেলের হাতে যদি দুটা পয়সা হয়, তখন তার মধ্যে নানা বিলাসিতা ঢুকে পড়ে। আমার মধ্যেও ঢুকেছে। শীতের দিনেও আমি এসি ছেড়ে ডাবল লেপ গায়ে দেই।

সুইজারল্যান্ডে যথেষ্ট গরম। ঘরে এসি নেই। সিলিং পাখাও নেই। কয়েকটা ফ্লোর ফ্যান আছে, যার পাখা অতি দুর্বলভাবে ঘুরছে। আমার চিমশা

মুখ দেখে হাসান আমাকে একটু দূরে নিয়ে গলা নামিয়ে বলল, আপনার এবং শাওন ভাবির জন্যে ভালো হোটেলের ব্যবস্থা আছে। অভিনেত্রী মৌসুমী এবং নায়ক মাহফুজ এই হোটেলেই ছিলেন। তারা হোটেল খুব পছন্দ করেছেন।

আমি বললাম, হাসান, আমি এতগুলি মানুষ নিয়ে এসেছি। এরা সবাই আমার অতি আপন। এদেরকে ফেলে হোটেলে যাবার প্রশ্নই আসে না। যে ব্যবস্থা করা হয়েছে আমি তার মধ্যেই থাকব। কোনো সমস্যা নেই।

হাসান বলল, আপনারা দুজন তাহলে শাহীনের শোবার ঘরে থাকুন। ঐ ঘরে এসি আছে।

আমি বললাম, আমি আমার নিজের শোবার ঘরে কাউকে থাকতে দেই না। কাজেই অন্যের শোবার ঘরে আমাদের ঢোকার প্রশ্নই উঠে না। চালাও বিছানার ব্যবস্থা করো। সবাই একসঙ্গে থাকব। মজা হবে।

আসন্ন মজার কথা ভেবে আমি উল্লসিত— এরকম ভঙ্গি করলেও মনে মনে চিন্তিত বোধ করলাম শাওনকে নিয়ে। ঘুমুবার জায়গা নিয়ে তার শুচিবায়ুর মতো আছে। সে আমার চেয়েও বিলাসী। তাকে দোষও দিতে পারছি না। সে অতি বড়লোকের মেয়ে।

আল্লাহপাকের অসীম রহমত, সে সমস্যাটা বুঝল। এমন এক ভাব করল যেন সবাই মিলে মেঝেতে গড়াগড়ি করার সুযোগ পেয়ে তার জীবন ধন্য। অভিনয় খুব ভালো হলো না। সে হতাশা লুকাতে পারল না।

রাতে ডিনার খেলাম হাসানের বিশেষ নৈপুণ্যে রাঁধা ডাল দিয়ে। ফার্মের মুরগি ছিল। ফার্মের মুরগি আমি খাই না। ঘন কৃষ্ণবর্ণের একটা বস্তুও ছিল। প্রশ্ন করে জানা গেল এটা সবজি। রান্নার গুণে কালো হয়ে গেছে।

ডাক্তার এবং ফারুক সবজি খেয়ে বলল, অসাধারণ। সুইজারল্যান্ডে পৌঁছার পর থেকে ভারা যা দেখছে বলছে অসাধারণ। খাবার টেবিলে কাঁচামরিচ দেখে বলল, অসাধারণ। সুইজারল্যান্ডেও কাঁচামরিচ আছে, আশ্চর্য! কাঁচামরিচে কামড় দিয়ে দেখে মিষ্টি। তখনো বলল, অসাধারণ। ঝাল নেই কাঁচামরিচ খেয়েছি। মিষ্টি কাঁচামরিচ এই প্রথম খাচ্ছি। মুহূর্তের মধ্যে এই দুজন টেবিলের সব কাঁচামরিচ শেষ করে ফেলল।

রাতে আমার এবং শাওনের থাকার ব্যবস্থা হলো জেলখানার সেলের চেয়েও ছোট একটা ঘরে। বিছানায় দু'জনের শোবার প্রশ্ন উঠে না। আমি মেঝেতে চাদর পেতে ঘুমুতে গেলাম। ফ্যানের সমস্যা আছে। ফ্যানটা জীবন্ত প্রাণীর মতো আচরণ শুরু করল। ঘুরতে ঘুরতে সে থেমে যায়। কাশির মতো শব্দ করে। আবার ঘুরে আবার থামে। পুরোপুরি এক স্বাধীন সত্তা।

টুটুল-তানিয়া দম্পতিকে একটা রুম দেয়া হয়েছে। সাইজে আমাদেরটার চেয়ে ছোট। তার উপর নেই ফ্যান।

বাকি সবার গণবিছানা। সেই ঘরেও ফ্যান নেই। সবাই গরমে অতিষ্ঠ। বাড়ির মালিক আমাদের জানালেন, সুইজারল্যান্ড অতি ঠাণ্ডার দেশ বলে ফ্যানের প্রচলন নেই। এসির তো প্রশ্নই উঠে না। সামারের এক দুই মাস গরম পড়ে। এই গরম সবাই Enjoy করে। গরমটাই তাদের কাছে মজা লাগে। আমাদের কারোই মজা লাগল না। শুধু ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক বলল, অতি আরামদায়ক আবহাওয়া।

ঘুমুতে যাবার আগে আগে আমি আমার দলের সবাইকে ডেকে একটা গোপন মিটিং করলাম। আমি বললাম, বুঝতে পারছি এখানে থাকা-খাওয়ার ব্যাপারটা কারো পছন্দ হচ্ছে না। আমাদের বাস্তবতা মানতে হবে। একটা টিভি চ্যানেল এতগুলো মানুষকে এত দূরের দেশে নিয়ে এসেছে। ইউরোপে হোটেল ভাড়া আকাশছোঁয়া। তাদের পক্ষে কোনো রকমেই সম্ভব না সবাইকে হোটেলে রাখা। তোমরা দয়া করে নায়ক-নায়িকাদের মতো নখরা করবে না। তোমরা চরিত্র অভিনেতা। চরিত্র অভিনেতারা অভিনয় করে, নখরা করে না।

তারচেয়ে বড় কথা হাসান আমার ছাত্র। তাকে আমি পছন্দ করি। সে যেন তোমাদের কোনো কথায় বা আচরণে কষ্ট না পায়। তার আগ্রহের কারণেই

তোমরা ভূস্বর্গ হিসেবে পরিচিত একটা দেশ দেখবে। এর মূল্যও কম না। সারাদিন আমরা কাজ করব। রাতে ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ব। এক ঘুমে রাত কাবার। সামান্য কয়েক ঘন্টার জন্যে কি ফাইভ স্টার হোটেল লাগবে?

কথা দিয়ে মানুষকে ভোলানোর ক্ষমতা আমার আছে! (কথাশিল্পী না?) সবাই বুঝল। ফারুক অতি আগ্রহের সঙ্গে বলল, প্রয়োজনে মেঝেতে শুয়ে থাকব। আমি বললাম, মেঝেতেই তো শুয়ে আছ। সে চুপ করে গেল।

ভোরবেলা দলবল নিয়ে শুটিং করতে বেরুবার সময় সবচে' বড় দুঃসংবাদটা শুনলাম। আমাদের শুটিং করতে হবে চুরি করে। পুলিশ দেখতে পেলেই ধরে নিয়ে যাবে। কারণ শুটিং-এর অনুমতি নিতে বিপুল অংকের অর্থ লাগে। ইনস্যুরেন্স করতে হয়।

হাসান সহজ ভঙ্গিতে বলল, পুলিশ আছে কি নেই এটা দেখে শুটিং করতে হবে। পুলিশ যদি ধরে ফেলে তাহলে বলতে হবে আমরা বেড়াতে এসেছি। হোম ভিডিও করছি। দেশে বন্ধুবান্ধবকে দেখাব।

অন্ধ সেজে গিটার বাজিয়ে ভিক্ষা করছে বাংলাদেশী এক ছেলে (টুটুল)। তার স্ত্রী (শাওন) এসেছে তাকে এখান থেকে নিয়ে যেতে।

আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। শুটিংটা হবে কীভাবে?

হাসান বলল, নিশ্চিন্ত থাকেন। ফাঁক ফোকর দিয়ে বের করে নিয়ে আসব। শুধু শুটিং চলাকালীন সময় আপনি ধারেকাছেও থাকবেন না। এটা সাগর ভাইয়ের অর্ডার।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, আমি ধারেকাছে থাকব না কেন?

হাসান বলল, পুলিশ যদি আপনাকে ধরে নিয়ে যায় তাহলে বিরাট কেলেঙ্কারি হবে। বাংলাদেশ এম্বেসি ধরে টান পড়বে।

আমার কলিজা গেল শুকিয়ে।

প্রথম দৃশ্য শুরু হলো। বাংলাদেশের এক ছেলে অন্ধ সেজে গিটার বাজিয়ে ভিক্ষা করে। তার স্ত্রী এসে (শাওন) তাকে এখান থেকে বকাঝকা করতে করতে নিয়ে যায়। অন্ধ ছেলের ভূমিকায় অভিনয় করছে টুটুল। তাকে ফোয়ারার পাশে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। সামনে হাতে লেখা সাইনবোর্ড— Help a blind.

টুটুলের গলা চমৎকার। গিটারের হাত চমৎকার। সে মুহূর্তের মধ্যেই জমিয়ে ফেলল। ক্যামেরা অনেক দূরে। কেউ বুঝতেই পারছে না ক্যামেরা চলছে। এক থুরথুরি বুড়ি চোখ বড় বড় করে কিছুক্ষণ গিটার শুনে দশ ইউরো একটা নোট টুটুলের হাতে গুজে দিল। টুটুল বিস্মিত।

এখন শাওন যাবে, টুটুলকে বকাঝকা করতে করতে নিয়ে আসবে— ঠিক তখন স্বাধীন হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, হুমায়ূন ভাই, পুলিশ আসছে।

আমি কাউকেই চিনি না এমন ভঙ্গিতে লম্বা লম্বা পা ফেলে হাঁটা দিলাম। শাওন বলল, তুমি আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছ কেন?

কিছুক্ষণের মধ্যেই চুরি করে নাটক বানানোর মজা পেয়ে গেলাম। নিষিদ্ধ কিছু করছি, এই আনন্দ প্রধান হয়ে গেল। ফ্রেম কী হচ্ছে জানি না। মনিটর নেই। অ্যাসিসটেন্ট ডিরেক্টর নেই। লেফট ইন রাইট আউট নামক জটিল বিষয় আমার মোটা মাথায় কখনো ঢোকে না। আমার সাহায্যে শাওন এগিয়ে এলো। সে আবার আগমন নির্গমন এবং 'লুক' খুব ভালো বোঝে। 'লুক' বিষয়টা কী পাঠকদের বুঝিয়ে দেই। লুক হলো পাত্রপাত্রী কোন দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কথা বলছে। ভিডিওতে এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লুক ঠিক না হলে দেখা যাবে নায়ক তার বান্ধবীর দিকে না তাকিয়ে সম্পূর্ণ উল্টো দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে মাথা নাড়ছে এবং কথা বলছে।

ভিডিওর কাজে আমাকে পুরোপুরি নির্ভর করতে হলো ক্যামেরাম্যান এবং শাওনের উপর।

ক্যামেরাম্যানের নাম তুফান। ঝকঝকে চোখের লম্বা পোশাকে ফিটফাট যুবা পুরুষ। মাথাভর্তি টাক না থাকলে তাকে নায়কের চরিত্র দেয়া যেত। তুফান ভারী ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে তুফানের মতোই ছোটাছুটি করে। ক্যামেরা কাঁধেই রাখতে হবে, স্ট্যান্ডে বসানোর উপায় নেই। পুলিশ চলে আসতে পারে। হোম ভিডিও যারা করে তারা ক্যামেরার জন্যে স্ট্যান্ড নিয়ে আসে না।

আমি চিন্তিত, ক্যামেরায় কী ছবি আসছে কে জানে! আমাদের সঙ্গে না আছে লাইট, না আছে লাইট কাটার, না আছে শব্দ ধারণের বুম। শব্দের সমস্যার সমাধান আছে, পরে ডাব করা যাবে। ছবি নষ্ট হলে কী করব! কাঁধের ক্যামেরা যদি কাঁপে ছবিও কাঁপবে। এত দূর দেশে এসে যদি এমন ছবি নিয়ে যাই যা দেখে মনে হবে পাত্র-পাত্রী সবাই ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত, সবার মধ্যেই কাঁপুনি, তাহলে হবে কী?

তুফান আমাকে আশ্বস্ত করল। সে বলল, স্যার সব ঠিক আছে, আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। উপরে আল্লাহ আছেন।

উপরে নিচে সবদিকেই আল্লাহ আছেন, তবে তিনি চুরি করে ভিডিও গ্রহণের ব্যাপারটা কি ভালোমতো নেবেন?

এদিকে প্রথম দিনেই দু'টি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। স্বাধীন এক অতি রূপবতীর (হুমায়ূন আহমেদের নায়িকাদের চেয়েও রূপবতী) প্রেমে পড়ে গেল। মেয়ে সুইস, জার্মান ছাড়া অন্য ভাষা জানে না। স্বাধীনও ইংরেজি এবং সিলেটি ভাষা ছাড়া কিছু জানে না। প্রেম একপক্ষীয় না, দু'পক্ষীয়। আমি কিছুতেই বুঝতে পারলাম না, ইশারা ইঙ্গিতে কী করে এত অল্প সময়ে এমন গভীর প্রেম হয়!

সন্ধ্যাবেলায় দেখি স্বাধীন উসখুস করছে। জানা গেল মেয়ে তাকে ডিনারের নিমন্ত্রণ করেছে। রাতে যদি কাজ না করি তাহলে সে ডিনারে যাবে। আমি ডিনারে যাবার অনুমতি দিলাম।

স্বাধীন আবেগমথিত গলায় বলল, আমাদের জন্যে একটু দোয়া করবেন হুমায়ূন ভাই।

আমি বললাম, দোয়া লাগবে কেন?

সে বলল, আমরা বিয়ের কথা চিন্তা করছি। সে শুধু একটা শর্ত দিয়েছে।

কী শর্ত?

স্বাধীন খসরু লাইটম্যানের ভূমিকায়।

পরে আপনাকে বলব।

স্বাধীন ডেটিং-এ চলে গেল। তার চেহারা চোখ-মুখ উদভ্রান্ত।

দ্বিতীয় সমস্যা এজাজ এবং ফারুককে নিয়ে। তারা ডলার যা এনেছে প্রথম দিনেই সব শেষ। দু'জন এখন কপর্দকশূন্য। দু'জনই মুখ শুকনা করে বসে আছে।

আমি বললাম, কেনাকাটা কী করেছ যে প্রথম দিনেই সব শেষ?

সাবান কিনেছি।

সাবান কিনেছ মানে কী?

দু'জনই স্যুটকেস বের করল। স্যুটকেস ভর্তি শুধু সাবান। নানান রঙের, নানান ঢং-এর।

এত সাবান কেন কিনেছ?

ফারুক বলল, দেখে এত সুন্দর লাগল! তাছাড়া দেশে এই জিনিস পাওয়া যায় না।

নাটকে পিকনিকের একটি দৃশ্য আছে। পিকনিকের দৃশ্য করার জন্য রাইন নদীর পাশে ছোট্ট পার্কের মতো একটা জায়গা খুঁজে বের করা হলো।

হাসান দু'জনকেই তিনশ' ডলার করে দিল। এরা পরের দিন সেই ডলার দিয়েও সাবান কিনে ফেলল।

ডাক্তার এজাজ সাবানের বস্তা নিয়ে দেশে ফিরতে পারে নি। এয়ার লাইন তার সাবানভর্তি দু'টা স্যুটকেসই হারিয়ে ফেলে। ফারুক সাবান নিয়ে দেশে ফিরতে পেরেছে। শুনেছি এইসব সাবানের একটাও সে নিজে ব্যবহার করে নি, কাউকে ব্যবহার করতেও দেয় নি। সবই সাজিয়ে রাখা। তার জীবনের বর্তমান স্বপ্ন আবার বিদেশে গিয়ে সাবান কিনে নিয়ে আসা।

শুটিং পুরোদমে চলছে। সুইজারল্যান্ডের সুন্দর সুন্দর জায়গা ব্যবহার করা হচ্ছে। রাইন নদী, রাইনস ফল, নেপোলিয়ানের বাড়ি— কিছুই বাদ যাচ্ছে না।

খুব উৎসাহ নিয়ে রাইন নদী দেখে ধাক্কার মতো খেলাম। আমরা পদ্মা মেঘনার দেশের মানুষ, আমাদেরকে কি বড় সাইজের খাল দিয়ে ভুলানো যায়? ভবে সবই ঝকঝকে। মনে হয় পুরো সুইজারল্যান্ডকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রাখা হয় শুধুমাত্র ছবি তোলার জন্যে। গাছের প্রতিটি পাতা সবুজ।

একটা শুকনা পাতা বা মরা ডাল নেই। গাছের নিচেও শুকনা পাতা পড়ে থাকা দরকার। সেইসব কোথায় গেল? পাতা কুড়ানির দল তো চোখে পড়ল না।

নাটকে পিকনিকের একটি দৃশ্য আছে। বেশ বড় দৃশ্য। এই দৃশ্যে পুরো একটা গান আছে। নাটকীয় অনেক ব্যাপার-স্যাপার আছে। পিকনিকের দৃশ্য করার জন্যে রাইন নদীর পাশে ছোট্ট পার্কের মতো একটা জায়গা শাহীন এবং হাসান খুঁজে বের করল।

ছবির দেশে সবকিছুই ছবির মতো। পার্কটাও সে-রকম। নাগরিক সুযোগ-সুবিধা আছে, অর্থাৎ বাথরুম আছে। বারবিকিউয়ের ব্যবস্থা আছে। একপাশেই আপেলের বাগান। গাছভর্তি আপেল। অন্যপাশে নাসপাতি বাগান। ফল ভারে প্রতিটি বৃক্ষ নত। আমরা মহানন্দে বারবিকিউয়ের ব্যবস্থায় লেগে গেলাম। মেয়েরা মনের আনন্দে ছুটাছুটি করতে লাগল। তাদের মুগ্ধ করল রাইন নদীতে সাঁতার কাটতে ব্যস্ত একদল রাজহাঁস। সাইজে দেশী রাজহাঁসের প্রায় দ্বিগুণ। গলা অনেক লম্বা। শুনেছি এরা প্রকৃতিতে ভয়ঙ্কর। মেজাজ খারাপ হলে এরা বিকট শব্দ করে ছুটে এসে কামড়ে দেয়।

মেয়েরা রাজহাঁসের দলকে পোষ মানিয়ে ফেলল। তারা হাতে পাউরুটি ধরে এগিয়ে দিচ্ছে। রাজহাঁসের দল কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। মেয়েদের ভঙ্গি রাজহাঁসদের দলকে পোষ মানানোর ক্ষমতায় অবাক হলাম না। যারা পুরুষদের পোষ মানায়, তারা সবাইকেই পোষ মানাতে সক্ষম।

আমাদের আনন্দ-উল্লাসে হঠাৎ বাধা পড়ল। দুই সুইস জিপ গাড়িতে করে উপস্থিত। শাহীনের সঙ্গে তাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো। আমরা তার এক বর্ণও বুঝলাম না। সব কথাই হলো জার্মান ভাষায়। এখানে বঙ্গানুবাদটা দিচ্ছি।

সুইস : তোমরা কী করছ জানতে পারি?

শাহীন : পিকনিক করছি। ফ্যামিলি হলি ডে।

সুইস : তোমরা কি জানো যে, এটা একটা পাবলিক প্রপার্টি? আপেল এবং নাসপাতি বাগান আমার।

শাহীন : আমরা তো আপেল এবং নাসপাতি বাগানে যাচ্ছি না। আমরা নদীর ধারে পিকনিক করছি।

সুইস : এই জায়গাও আমার। [কুৎসিত গালি। গালির অর্থ কী শাহীন বলল না। এতে মনে হচ্ছে ভয়ঙ্কর কিছু হবে।]

শাহীন : [গালি, সে জার্মান গালির সঙ্গে বাঙলা গালি মিশিয়ে দিল। বাংলা ভাষায় সবচে' ভদ্র গালিটা ছিল— খা... কির পুলা অফ যা।]

সুইস : আমি তোমাদের পুলিশে ধরিয়ে দেব।

শাহীন : যা তোর বাপদের খবর দিয়ে আয়।

সুইস দু'জন হুস করে গাড়ি নিয়ে বের হয়ে গেল। আমি সব শুনে বললাম, অন্যের জায়গায় আমরা কেন পিকনিক করব? চল আরেকটা জায়গা খুঁজে বের করি।

শাহীন বলল, স্যার, সুইস সরকারের আইন বলে নদীর পাড় ঘেঁসে সমস্ত সুন্দর জায়গায় সবার অধিকার। এটা যদি ওর জায়গাও হয় তারপরেও আমাদের অধিকার আছে এখানে পিকনিক করার।

আমি বললাম, ব্যাটা তো মনে হয় পুলিশে খবর দিতে গেল।

শাহীন বলল, পুলিশে খবর দেবে না, কারণ আইন আমাদের পক্ষে। পুলিশে খবর দিলে নিজেই বিপদে পড়বে, তবে সে বন্দুক নিয়ে ফিরে আসতে পারে।

ডাক্তার এজাজ ও ফারুক সবকিছুতেই মুগ্ধ।

বলো কী!

বন্দুক দিয়ে গুলি করবে না— ফাঁকা আওয়াজ করে ভয় দেখাবে।

আমরা তখন কী করব?

ফাইট দিব। মেরে তক্তা বানিয়ে ফেলব। এখনো বাঙালি চেনে না।

শাহীন আবারো খানকি বিষয়ক গালিতে ফিরে গেল।

আমি স্তম্ভিত। এ কী বিপদে পড়লাম! আমি একা স্থান ত্যাগের পক্ষে, বাকি সবাই 'বিনা যুদ্ধে নাহি দেব সুচাগ্র মেদেনী' টাইপ। মেয়েরা বিশেষ করেই রণরঙ্গিনী। বাঙালি রমণী কী বিষয় তারা তা সুইসদের শিখিয়ে দিতে আগ্রহী।

চ্যালেঞ্জার লুঙ্গি পরে রাইন নদীর সুশীতল জলে সাঁতার কাটছিল। সে উঠে এসে লুঙ্গি বদলে প্যান্ট পরল। লুঙ্গি পরে মারামারি করা যায় না।

আমার সিক্সথ সেন্স বলছিল ওরা ফিরে আসবে না। ঝামেলা কে পছন্দ করে!

আমার সিক্সথ সেন্স ভুল প্রমাণিত করে সেই দু'জন গাড়ি করে আবার উপস্থিত হলো। শাহীন বারবিকিউর চুলা থেকে জ্বলন্ত চ্যালাকাঠ তুলে হাতে নিল। স্বাধীনের দিকে তাকিয়ে দেখি তার হাতে সুইস নাইফ।

দু'জন গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলো। তাদের হাতে বন্দুক দেখা গেল না। তবে পিস্তল জাতীয় কিছু পকেটে থাকতে পারে।

শাহীনের সঙ্গে তাদের নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

সুইস : আমরা সরি বলার জন্যে এসেছি। তোমাকে যে সব গালাগালি করেছি তার জন্যে Sorry, আমাদের এ উপলব্ধি গ্রহণ করলে খুশি হব।

শাহীন : এ উপলব্ধি গ্রহণ করা হলো।

সুইস : তোমরা কোন দেশ থেকে এসেছ?

শাহীন : আমার বন্ধুরা বাংলাদেশ থেকে এসেছেন, আমি সুইস নাগরিক।

সুইস : তোমাদের পিকনিক শুভ হোক।

শাহীন : অল্পের জন্যে বাঁচলি, আইজ তরে জানে মাইরা ফেলতাম।

সুইস : কী বললে বুঝতে পারলাম না।

শাহীন : বাংলা ভাষায় বলেছি, তোমাদের ধন্যবাদ।

মহান বাঙালির সম্মান বজায় রইল। শুটিংয়ের শেষে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছে। আমি ঘোষণা দিলাম, আগামীকাল অফ ডে। আমরা কোনো শুটিং করব না।

হাসানের মুখ শুকিয়ে গেল। শুটিং অফ মানে আরেকদিন বাড়তি থাকা। বাড়তি খরচ। বাড়তি টেনশন।

আমি হাসানকে আশ্বস্ত করার জন্যে বললাম, তুমি টেনশন করো না। আমরা Extra কাজ করে আগামীকালের ক্ষতি পুষিয়ে দেব।

আগামীকাল কাজ করবেন না কেন?

আগামীকাল অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাংলাদেশের ক্রিকেট খেলা। আমি ক্রিকেট খেলা দেখব।

শাহীন বলল, ক্রিকেট খেলা দেখা যাবে না।

কেন দেখা যাবে না?

শাহীন বলল, এখানকার কোনো বাঙালির বাড়িতে ডিশের লাইন নেই। খরচের ভয়ে তারা ডিশ লাইন নেয় না।

আমি বললাম, রেস্টুরেন্টগুলোতে খেলা দেখার ব্যবস্থা নেই?

সুইসরা ক্রিকেট ভক্ত না। তারা ফুটবল ছাড়া কোনো খেলা দেখে না।

আমি হাসানের দিকে ফিরে বললাম, তোমার দায়িত্ব কাল আমাকে খেলা দেখানো।

হাসান বলল, অবশ্যই।

পাঠকরা ভুলেও ভাববেন না— আমি ক্রিকেটের পোকা, কে কখন কয়টা ছক্কা মেরেছে, কে কতবার শূন্যতে আউট হয়েছে, এসব আমার মুখস্থ। মোটেও না। আমি শুধু বাংলাদেশের খেলা থাকলেই দেখি। অন্য খেলা না।

বাংলাদেশের কোনো খেলা আমি মিস করি না। ঐ দিন আমার সকল কর্মকাণ্ড বন্ধ। বাংলাদেশের কোনো খেলোয়াড় যখন চার মারে, আমার কাছে মনে হয় চারটা সে যারে নি। আমি নিজে মেরেছি। এবং আমাকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। বাংলাদেশের কোনো বোলার যখন কঠিন বল করে তখন আমার মনের ভাব হচ্ছে— 'বলটা কেমন করলাম দেখলিরে ছাগলা? কলজে নড়ে গেছে কি-না বল! আসল বলিং তো শুরুই করি নি। তোকে আজ পাতলা পায়খানা যদি না করাই আমার নাম হুমায়ূন আহমেদই না।'

আনন্দে চোখে পানি আসার মতো ঘটনা আমার জীবনে অনেকবার ঘটেছে। যে ক'বার বাংলাদেশ ক্রিকেটে জিতেছে প্রতিবারই আমার চোখে

তানিয়া ও শাওন : সুইজারল্যান্ড সফরকারী দলের দুই নারী সদস্য।

পানি এসেছে। বাংলাদেশী ক্রিকেটের দুর্দান্ত সব খেলোয়াড়দের ধন্যবাদ। তারা চোখভর্তি পানি নিয়ে আসার মতো আনন্দ একজন লেখককে বারবার দিচ্ছেন। পরম করুণাময় এইসব সাহসী তরুণের জীবন মঙ্গলময় করুক, এই আমার শুভকামনা।

আমরা যেখানে আছি (রুখতেনস্টাইন) সেখানে ক্রিকেট খেলা দেখার কোনো ব্যবস্থা হাসান করতে পারল না। তাকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত মনে হচ্ছিল। সে বাসে করে আমাদের নিয়ে রওনা হলো সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জুরিখে। জুরিখে অনেক বাঙালি, তাদের কারো বাসায় Star Sports কিংবা ESPN তো থাকবেই।

কাউকে পাওয়া গেল না। আমরা পাবে পাবে ঘুরতে লাগলাম। সাধারণত পাবগুলোতে খেলা দেখানো হয়। কোথাও পাওয়া গেল না। এই সময় খবর এলো জুরিখের একপ্রান্তে অস্ট্রেলিয়ানদের একটা পাব আছে। অস্ট্রেলিয়া-বাংলাদেশের খেলা সেই পাবে নিশ্চয়ই দেখানো হবে। গেলাম সেখানে, সেই পাবে রাগবি দেখাচ্ছে। আমরা ক্রিকেট দেখতে চাই শুনে পাবের অস্ট্রেলিয়ান

মালিক বিস্মিত হয়ে তাকাল।

স্বাধীন বলল, আমরা তোমাদেরকে একবার হারিয়েছি। আজও হারাব। আমাদের এই আনন্দ পেতে দাও। প্লিজ।

অস্ট্রেলিয়ান মালিক বলল, এসো। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

খেলা আগেই শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাট করছে। অবস্থা কেরোসিন। আমরা আয়োজন করে বসার দশ মিনিটের মধ্যে বাংলাদেশের চারজন খেলোয়াড় আউট।

আমরা মাথা নিচু করে বসে রইলাম। আমি অস্ট্রেলিয়ান পাব মালিককে বললাম, আমরা ঠিক করেছি আজ ক্রিকেট দেখব না। তুমি চ্যানেল বদলে দাও। সবাই রাগবি দেখতে চাচ্ছে। আমরা আসলে রাগবির ভক্ত।

ভ্রমণকাহিনী লেখার কিছু নিয়মকানুন আছে। যে-সব জায়গা দেখা হয় তার বর্ণনা দিতে হয় (ছবিসহ)। ছবিতে লেখক থাকেন। প্রতিটি ছবির সঙ্গে ক্যাপসন থাকে। নমুনা।

রুখতেনস্টাইনের রাজপ্রাসাদের সামনে লেখক।

লেখকের পাশে তার স্ত্রী শাওন।

রুখতেনস্টাইন রাজপ্রাসাদ সেখানে মুখ্য না। মুখ্য হলো লেখক এবং লেখক পত্নী হাসি হাসি মুখে দু'জন দু'জনের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভ্রমণকাহিনীতে নিজ দেশের সঙ্গে একধরনের তুলনামূলক বিষয়ও থাকতে হবে। দেশে কিছুই নেই, বাইরে স্বর্গ— এই বিষয়টা আসতে হবে। যে-সব জায়গায় লেখক গেলেন, তার বর্ণনা এমনভাবে থাকতে হবে যেন পাঠক পড়তে গিয়ে টাসকি খেয়ে ভাবে— মানুষটা কত জ্ঞানী। নেপোলিয়ানের বাড়ি প্রসঙ্গে লিখতে হবে— কবে কখন নেপোলিয়ান এসে রাইন নদী দেখে মুগ্ধ হয়ে

আমার হাস্যমুখী পুরুষ সফরসঙ্গীরা।

এই প্রাসাদ নির্মাণ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসীরা এই বাড়ি নিয়ে কী করে ইত্যাদি। এক ফাঁকে নেপোলিয়ানের জীবনীও কিছুটা দিতে হবে। নয়তো পাঠকের জ্ঞান অসম্পূর্ণ থাকবে।

আমার নানান সমস্যার একটি হচ্ছে, নিজের দেশ ছাড়া অন্য কোনো দেশই আমার ভালো লাগে না। পাঠকদের কেউ কেউ হয়তো চোখ কপালে তোলার মতো করে বলবেন— 'বাপরে, ব্যাটা দেশপ্রেম ফলাচ্ছে।' আমি কিন্তু আমার কথা প্রমাণ করে দিতে পারি। আমেরিকায় পড়াশোনা শেষ করে সেই দেশেই বিরাট বেতনের চাকরি নিয়ে থেকে যাবার সুযোগ আমার ভালো মতোই ছিল। আমার প্রফেসর বারবারই বলেছেন— 'তোমার পরিবারের সবার জন্যেই আমি সিটিজেনশিপের ব্যবস্থা করছি, তুমি থেকে যাও। দেশে ফিরে কী করবে! আমেরিকা ল্যান্ড অব অপরচুনিটি।' আমি থাকি নি। দুশ' ডলার সঞ্চয় নিয়ে দেশে ফিরে এসেছি।

আমার ঘনিষ্ঠজনরা জানে, আমাকে দেশের বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে রাজি করানো কতটা কষ্টের। কেন দেশের বাইরে যেতে চাই না? দেশের বাইরের কোনো কিছুই আমাকে স্পর্শ করে না। মনে লাগে না। বাইরে কম সময় কাটাই নি। আমেরিকায় এক নাগাড়ে ছয় বছর কাটালাম। কত বৈচিত্র্যের সুন্দর দেশ। কিন্তু আমার একদিনের জন্যেও মনে হয় নি— এই দেশ আমার হতদরিদ্র দেশের চেয়েও সুন্দর। পৃথিবীর কোন দেশে পাব আমি আমার দেশের উথালপাতাল জোছনা? কোথায় পাব আষাঢ়ের আকাশ ভাঙা বৃষ্টি? আমেরিকা থেকে একবার আমি মা'কে চিঠি লিখলাম— অনেকদিন বর্ষার ব্যাঙের ডাক শুনি না। আপনি কি ব্যাঙের ডাক রেকর্ড করে ক্যাসেট করে পাঠাতে পারবেন?

চিঠি পৌঁছানোর পর আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা (আহসান হাবীব, সম্পাদক উন্মাদ) ক্যাসেট প্লেয়ার নিয়ে ডোবা ও খন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। যথাসময়ে আমার কাছে ব্যাঙের ডাকের ক্যাসেট চলে এলো। এক রাতে দেশের ছেলেমেয়েদের বাসায় দাওয়াত করেছি। সবাই খেতে বসেছে, আমি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হিসেবে ব্যাঙের ডাকের ক্যাসেট ছেড়ে দিলাম। ভেবেছিলাম সবাই হাসাহাসি করবে। অবাক হয়ে দেখি, বেশিরভাগ ছেলেমেয়ের চোখে অশ্রু চকচক করতে লাগল।

থাক এই প্রসঙ্গ, ভূস্বর্গ সুইজারল্যান্ড সম্পর্কে বলি। এই দেশ ইউরোপের যে-কোনো পাহাড়ি দেশের মতোই। আলাদা সৌন্দর্যের কিছু নেই। আমি আমার হাতের বলপয়েন্টের দোহাই দিয়ে বলছি— আমার দেশের রাঙামাটির সৌন্দর্য সুইজারল্যান্ডের সৌন্দর্যের চেয়ে কোনো অংশেই কম না। তফাত

একটাই, আমরা পরিব ওরা ধনী। পরম করুণাময় ধনী-দরিদ্র বিবেচনা করে তাঁর প্রকৃতি সাজান না। তিনি সাজান নিজের ইচ্ছায়।

সুইজারল্যান্ডের মানুষগুলি ভালো। বেশ ভালো। হাসিখুশি। বিদেশীদের দিকে অবহেলার চোখে তাকায় না। আগ্রহ নিয়ে তাকায়। আগ্রহ নিয়ে গল্প করতে আসে। শাওনকে বেশ কিছু বিদেশিনী জিজ্ঞেস করলেন— তুমি চামড়া ট্যান করার জন্যে যে লোশন ব্যবহার করো, তার নাম জানতে পারি?

শাওন বলল, আমাদের চামড়া জন্ম থেকেই এরকম। কোনো লোশন দিয়ে ট্যান করানো হয় নি।

তারা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছে— তোমরা কত না ভাগ্যবতী!

স্থানীয় অধিবাসীদের মানসিকতা কেমন— তার উদাহরণ হিসেবে একটা ছোট্ট গল্প বলছি। আমাদের নাটকে (রূপালী রাত্রি) আছে ডাক্তার এজাজ এবং ফারুক গ্রামের কামলাশ্রেণীর মানুষ। প্রথমবার সুইজারল্যান্ডের মতো একটা দেশে আসার সুযোগ হয়েছে। তারা স্যুট পরে মহানন্দে সুইজারল্যান্ডের পথে পথে ঘুরছে। যাকেই পাচ্ছে তাকেই বলছে, 'হ্যালো'।

শুটিংয়ের ফাঁকে তানিয়া, চ্যাপ্লোর ও শাওন।

নাটকের একটি দৃশ্য আছে, এরা দুইজন এক সুইস তরুণীকে বলবে, 'হ্যালো'। তরুণী তাদের দিকে তাকাবে। জবাব না দিয়ে চলে যাবে। ডাক্তার এজাজ ফারুককে বলবে— 'এই মাইয়া ইংরেজি জানে না।'

সুইজারল্যান্ডের তরুণীর ভূমিকায় অভিনয় করার জন্যে এক পথচারী তরুণীকে প্রস্তাব করতেই সে রাজি হয়ে গেল। অভিনয় করল। অভিনয় শেষে সে ডাক্তার এজাজকে বলল, তুমি হ্যালো বলেছ, আমি জবাব না দিয়ে চলে গেছি। আমি কিন্তু এরকম মেয়ে না। আমাকে এরকম করতে বলা হয়েছে বলে আমি করেছি। তারপরেও আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

আধুনিক পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরের বিরাট গুরুত্ব। বার্ন শহরের এক পেটেন্ট অফিসের তেইশ বছর বয়েসী কেরানি Annals of Physics-এ তিন পাতার একটি প্রবন্ধ লিখে পদার্থবিদ্যার গতিপথই সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিলেন। পেটেন্ট অফিসের সেই কেরানির নাম আলবার্ট আইনস্টাইন। বার্ন শহরে তাঁর একটি মিউজিয়াম আছে। আমার খুব ইচ্ছা হলো এই মিউজিয়ামটা দেখে যাই (মিউজিয়াম দেখার বিষয়ে আমার আগ্রহ নেই। আমি কোথাও বেড়াতে গেলে মিউজিয়াম দেখি না। সমুদ্র, জঙ্গল, পাহাড়, পর্বত দেখি)। শাহীনকে বলতেই সে বলল, কোনো ব্যাপারই না। নিয়ে যাব।

একদিন শাওনকে নিয়ে তার সঙ্গে বের হলাম। সে আমাদের এক ক্যাসিনোতে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, হুমায়ূন ভাই, এই ক্যাসিনো ছোটখাট। এখানে জুয়া খেলে আপনার ভালো লাগবে।

আমি বললাম, আইনস্টাইন সাহেবের খবর কী?

উনার জায়গাটা এখনো বের করতে পারি নি।

ফিজিক্স বাদ দিয়ে জুয়া?

শাহীন খুবই উৎসাহের সঙ্গে বলল, ক্যাসিনোতে জুয়া খেলতে লাইসেন্স লাগে। মেম্বার হতে হয়। আপনাদের জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা করেছি।

ঈশ্বর এবং জুয়া নিয়ে আইনস্টাইনের একটি বিখ্যাত উক্তি আছে, যে উক্তি পরে ভুল প্রমাণিত হয়েছে।

কোয়ান্টাম মেকানিক্সের শুরুতে আইনস্টাইন থমকে গেলেন। কোয়ান্টাম মেকানিক্স তিনি মনেপ্রাণে নিতে পারলেন না। তিনি বললেন, ঈশ্বর জুয়া খেলেন না (God does not play dice)। দেখা গেল আইনস্টাইনের বক্তব্য

সঠিক না— ঈশ্বর জুয়া খেলেন।

তিনিই যখন খেলতে পারেন— আমার খেলতে অসুবিধা কোথায়? আমি শাওনকে নিয়ে এক টেবিলে বসে অতি দ্রুত পাঁচশ' ডলার হারলাম। শাহীন আনন্দিত গলায় বলল, মজা হচ্ছে না হুমায়ূন ভাই?

আমি বললাম, হচ্ছে।

সে গলা নামিয়ে বলল, আইনস্টাইন ফাইনস্টাইন বাদ দেন। বিদেশে এসেছেন, অঙ্ক করবেন না-কি?

তা তো ঠিকই।

পাঁচশ' হেরেছেন আরো হারেন— এই একটা জায়গাতেই হারলেও মজা।

জুয়ায় জেতার আনন্দটা কী আমি জানি না। কখনো জিততে পারি নি। আমার জুয়ার ভাগ্য খারাপ। এই লাইনে অতি ভাগ্যবান একজনের নাম স্বাধীন খসরু। তিনি স্ক্রাচ কার্ড নামক একধরনের জুয়া আগ্রহের সঙ্গে খেলেন। এক ইউরো, দুই ইউরো দিয়ে স্ক্রাচ কার্ড কিনেন। কার্ডের বিশেষ জায়গা ঘসা হয়। সেখানে যদি চারটা সাত উঠে আসে বা এই ধরনের কিছু হয় তাহলেই পুরস্কার।

সুইজারল্যান্ডে স্বাধীন খসরু এই কাণ্ড ঘটালেন। কার্ড ঘসার পর যে বস্তু বের হলো তার অর্থ, তিনি বিশ হাজার ইউরো পুরস্কার পেয়েছেন। তাৎক্ষণিকভাবে ইউরো পাওয়া যাচ্ছে না। সেদিন এবং তার পরের দিন ব্যাংক বন্ধ। অফিস টফিসও বন্ধ। আমাদের উত্তেজনার সীমা নেই। লক্ষ করলাম, সফরসঙ্গীদের মধ্যে হিংসা কাজ করতে শুরু করেছে। অনেকেই মত প্রকাশ করছে, শেষপর্যন্ত টাকা পাওয়া যাবে না। সামান্য কার্ড ঘসে কেউ এত টাকা পায়? কোনো একটা ঝামেলা অবশ্যই আছে।

আমি জানি কোনো ঝামেলা নেই। নিউইয়র্কে দু'জন বাঙালির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে— যারা পাঁচ ডলারে স্ক্রাচ কার্ড ঘসে এক মিলিয়ন ডলার করে পুরস্কার পেয়েছেন।

স্বাধীনের কার্ডের লেখা জার্মান ভাষায়। জার্মান ভাষা ভালো জানে এমন কয়েকজনকে দিয়ে কার্ড পড়ালাম। তারাও বললেন, ঘটনা সত্যি। এই কার্ড বিশ হাজার ইউরো জিতেছে।

হঠাৎ লাখপতি হয়ে যাওয়ায় স্বাধীন দলছুট হয়ে পড়ল। কেউ তার সঙ্গে ভালোমতো কথা বলে না। সেও আলাদা থাকে। আমাদের সঙ্গে খাওয়া-দাওয়া করে না। নগদ ইউরো খরচ করে রেস্টুরেন্টে খেতে যায়। সঙ্গে থাকে নতুন পাওয়া বান্ধবী। এই বান্ধবী স্বাধীনকে বলেছে, সে যদি সুইজারল্যান্ডে থেকে যায় তাহলে স্বাধীনকে সে বিয়ে করতে রাজি আছে। সুইজারল্যান্ডে থেকে যাওয়া তার জন্যে তেমন কোনো সমস্যা না। কারণ স্বাধীন ব্রিটিশ নাগরিক, তার পিছুটানও নেই। স্বাধীনকে মনে হলো নিমরাজি।

আমি শঙ্কিত বোধ করলাম। স্বাধীন অতি আবেগপ্রবণ ছেলে। আবেগের বশে বিয়ে করে বসতে পারে। সমস্যা একটাই, সে আবেগ ধরে রাখতে পারে না। স্বাধীনের সঙ্গে কথা বলা দরকার। লক্ষ করলাম, সে আমাকেও এড়িয়ে চলছে। নিজেই আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলতে গেলাম। নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো।

আমি : হ্যালো স্বাধীন!

স্বাধীন : (চুপ)

আমি : কনগ্রাচুলেশনস! বিশ হাজার ইউরো পেয়ে গেলে।

স্বাধীন : থ্যাং-ক য়্যু।

আমি : তারপর কী ঠিক করলে, এই দেশেই সংসার পাতবে?

রাইন নদীতে জলী রাজহাঁসকে পোষ মানাচ্ছে শাওন।

স্বাধীন : আমার কাছে সব দেশই সমান। বাংলাদেশে জন্ম হলেও জীবন কেটেছে ইংল্যান্ডে।

আমি : দু'দিনের পরিচয়ে একজনকে বিয়ে করে ফেললে পরে সমস্যা হবে না তো ?

স্বাধীন : যখন এরেঞ্জ ম্যারেজ হয় তখন তো স্বামী-স্ত্রীর পূর্বপরিচয় ছাড়াই বিয়ে হয়। তারা সুখী হতে পারলে আমরা কেন হতে পারব না ?

আমি : (চুপ)

স্বাধীন : হুমায়ূন ভাই, আমার অনুরোধ— এই বিষয়ে আমাকে আর কিছু বলবেন না।

আমি : বিয়েটা হচ্ছে কবে ?

স্বাধীন : একটু দেরি হবে। লাইসেন্স করাতে হবে। আপনারা শুটিং শেষ করে দেশে চলে যান, আমি পরে আসব।

আমি : আরো একটু চিন্তা ভাবনা করলে হতো না ?

স্বাধীন : চিন্তা ভাবনা তো করছি। সারারাতই চিন্তা করি। আগামীকাল সকালে আপনি আমাকে একটু সময় দেবেন ? আপনাকে নিয়ে মেয়ের মায়ের বাসায় যাব। এখানে আপনি ছাড়া আমার মুরুব্বি কেউ নেই।

আমি : ঠিক আছে যাব।

অভিনেতা ফারুক, স্বাধীন ও ডাক্তার এজাজ— তিন প্যাকে।

মেয়ের মায়ের বাড়িতে যাবার আগে আমরা গেলাম স্ক্রাচ কার্ড দেখিয়ে বিশ হাজার ইউরো তুলতে। সঙ্গে আছে শাহিন। সে জার্মান ভাষা জানে। আমরা জানি না।

কোম্পানির তরুণী কার্ড উল্টেপাল্টে বলল, হ্যাঁ, তোমরা বিশ হাজার ইউরো পেয়েছ।

আমরা তিনজন একসঙ্গে বললাম, থ্যাংক ইউ।

তরুণী বলল, তোমরা টাকা পাবে না। কারণ তোমরা কার্ডটা অতিরিক্ত খোঁচাখুঁচি করে নষ্ট করে ফেলেছ। যেখানে স্ক্রাচ করার কথা না সেখানেও করেছ।

শাহীন বলল, তুমি তো খুবই অন্যায় কথা বলছ।

তরুণী বলল, তুমি লইয়ারের কাছে যেতে পার।

অবশ্যই লইয়ারের কাছে যাব।

আমরা লইয়ারের কাছে গেলাম। তিনি বললেন, মামলা করলে অবশ্যই আমরা জিতব।

আমি বললাম, মামলা আমরা অবশ্যই করব।

লইয়ার বলল, আমি দশ হাজার ইউরো ফিস নেব। অর্ধেক এখন দিতে হবে।

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করা ছাড়া আমাদের কিছুই করার রইল না। কে দেবে উকিলকে এত টাকা ? আর টাকা দিলেই শেষ পর্যন্ত যে আমরা মামলায় জিতব তার গ্যারান্টি কী ?

স্বাধীনের দিকে তাকিয়ে আমার খুবই মায়া লাগল। বেচারা এই টাকার আশায় নিজের যা ছিল সব শেষ করেছে। অন্যের কাছে ধারও করেছে।

সব খারাপ জিনিসের একটা ভালো দিক থাকে। লটারির টাকা না পাওয়ার ভালো দিকটা হলো স্বাধীন ঘোষণা করল— এই পচা দেশে থাকার প্রশ্নই উঠে না। বিয়ে তো অনেক পরের ব্যাপার।

সুইজারল্যান্ডে বাসের সময় শেষ হলো। কী দেখলাম ?

ক. ছবির মতো সুন্দর কিছু জায়গা। সবই সাজানো। জঙ্গলের গাছগুলিও হিসাব করে লাগানো। কোন গাছের পর কোন গাছ, কত দূরত্বে— সব মাপা।

খ. অতি আধুনিক কেতায় সাজানো কিছু শপিংমল। পৃথিবীর হেন কোনো বস্তু নেই যা সেখানে নেই। দামেরও কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। দেশটা অতি

ধনী। এদের ক্রয়ক্ষমতা অনেক অনেক বেশি। জিনিসের দাম তো হবেই। রুপার কৌটায় এক কৌটা টুথপিক বিক্রি হচ্ছে বাংলাদেশী টাকায় পঁচিশ হাজার টাকায়। যেখানে দেয়াশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচানোর কাজ সারা যায়, সেখানে কেন পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করা হবে?

গ. দেখলাম কিছু সুখী মানুষ। অর্থনীতির কঠিন চাপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত মানুষ। যাদের পেছনে আছে ক্ষমতাধর এক রাষ্ট্র। উদাহরণ দেই— এক সুইস নাগরিক অস্ট্রিয়ায় স্কি করতে গিয়ে আহত হয়েছে। খবর পাওয়া মাত্র সুইজারল্যান্ড থেকে হেলিকপ্টার গেল। তাকে হেলিকপ্টারে নিজ দেশে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হলো।

এই দেশের সুখী মানুষদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগ নেই। তারা এক ভুবনের বাসিন্দা, আমরা অন্য ভুবনের। আমরাই শুধু বলতে পারি—

অর্থ নয় কীর্তি নয় স্বচ্ছলতা নয়
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভেতরে খেলা করে
আমাদের ক্লান্ত করে।

ওরা এই কথা বলে না, কারণ অর্থশূন্য জীবন তাদের কল্পনাতে নেই।

বিদায় সুইজারল্যান্ড।

বিদায় ভূস্বর্গ।

চন্দ্রযাত্রা

একটা ধাঁধা দিয়ে শুরু করি। চার অক্ষরে নাম এমন এক দেশ, যে নাম শুনলেই বাংলাদেশের মতো অনেক দেশের মানুষের চোখ চকচক করতে থাকে। হিন্টস দিচ্ছি— আ দিয়ে শুরু। শেষ অক্ষর কা।

হয়েছে— আমেরিকা।

এই দেশে যাবার জন্যে জীবনের শেষ প্রান্তে উপস্থিত হওয়া মানুষদের আতঙ্কে অধীর হয়ে আমেরিকান অ্যাম্বেসিতে বসে থাকতে দেখেছি। সঙ্গে দলিল দস্তাবেজ। বাড়ির দলিল, জমির দলিল, গাড়ির ব্লু বুক, ব্যাংকের কাগজ। তাঁরা প্রমাণ করবেন যে, দেশে তাঁদের যথেষ্ট বিষয়-আশয় আছে। ভিজিট ভিসায় বেড়াতে গেলেও ফিরে আসবেন। আল্লাহর কসম ফিরে আসবেন।

ভিসা রিজেক্ট হওয়ায় ভিসা অফিসে জনৈক বৃদ্ধ শোকে হার্টফেল করে মারা গেছেন— এই খবর 'প্রথম আলো' পত্রিকায় পড়েছি।

আমি একজনকে জানি যিনি দেশের সব মাজার জিয়ারত করে আজমির শরিফ যাচ্ছেন খাজা বাবার দোয়া নিতে। খাজা বাবার দোয়া পেলে ভিসা

অফিসারের মন গলবে, তিনি স্বপ্নের দেশে যেতে পারবেন। ইউরোপ-আমেরিকা যাবার ব্যাপারটা না-কি খাজা বাবা কন্ট্রোল করেন।

আমেরিকা নামক এই স্বপ্নের দেশে আমাকে দীর্ঘ দিবস, দীর্ঘ রজনী কাটাতে হয়েছে। ছয় বছরের বেশি। পিএইচডি করলাম। পিএইচডি শেষ করে Post Doc করলাম। দেশে ফেরার পরেও আরো চার-পাঁচবার যেতে হলো। আমেরিকা নিয়ে বেশ কয়েকটা বইও লিখলাম। *হোটেল গ্রেভার ইন, যশোহা বৃক্ষের দেশে, মে ফ্লাওয়ার*। শেষবার আমেরিকায় গেলাম নুহাশকে নিয়ে। পিতা-পুত্রের যুগলবন্দি ভ্রমণ। ফেরার পথে দু'জনই অসুস্থ হয়ে পড়লাম। নুহাশ ক্রমাগত বমি করছে, গায়ে জ্বর। আমার বুকে ব্যথা। আমি আতঙ্কগ্রস্ত। বুকের এই ব্যথা মানে হার্টবিষয়ক জটিলতা নয়তো? যদি সে-রকম কিছু হয়, দু'জনকেই প্লেন থেকে নামিয়ে দেবে। আমাকে ভর্তি করবে হাসপাতালে। নয় বছর বয়েসি নুহাশ তখন কী করবে?

দেশে ফিরে ঠিক করলাম, আর না। অতি দূরের দেশে আর যাব না। আমেরিকায় কখনো না।

তারপরেও ব্যাগ-স্যুটকেস গোছাতে হলো। আবার আমেরিকা। তবে এবার অন্য একজনের তল্পিবাহক হিসেবে। সেই অন্য একজনের নাম মেহের আফরোজ শাওন। সে *চন্দ্রকথা* ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পেয়েছে। বলিউড অ্যাওয়ার্ড। জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুরস্কার দেয়া হবে।

আমার জন্যেও কী কী পুরস্কার যেন আছে। পুরস্কার নেবার জন্যে আমেরিকায় যাবার মানুষ আমি না। আমি যাচ্ছি শাওনের জন্যে। পরিষ্কার বুঝতে পারছি, শাওনের নতুন দেশ দেখার আগ্রহ যেমন আছে, পুরস্কার নেবার আগ্রহও আছে।

এখন বিদেশে পুরস্কার বিষয়ে কিছু বলি। বেশ কয়েক বছর ধরে এটা শুরু হয়েছে। লন্ডন, আমেরিকা এবং দুবাই-এ পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান হয়।

শ্রেষ্ঠ গায়ক
শ্রেষ্ঠ গায়িকা
শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী
শ্রেষ্ঠ নায়ক
শ্রেষ্ঠ নায়িকা
... ...

অনেক ক্যাটাগরি। বড় হল ভাড়া করা হয়। টিকিট বিক্রি করা হয়। টিকিট বিক্রির টাকাতেই খরচ উঠে আসে। টিভি রাইট বিক্রি হয়, সেখান থেকে টাকা আসে। সবচে বেশি টাকা আসে স্পন্সরদের কাছ থেকে। স্পন্সরের ব্যাপারটা খোলাসা করি। মনে করা যাক, আপনি একজন জনপ্রিয় নায়িকা। আপনাকে একটি পুরস্কার (ভারী ক্রেস্ট, ঠিকমতো ধরতে হবে। হাত ফসকে পায়ে পড়লে জখম হবার সমূহ সম্ভাবনা) দেয়া হবে। যিনি পুরস্কার হাতে তুলে দেবেন তিনিই

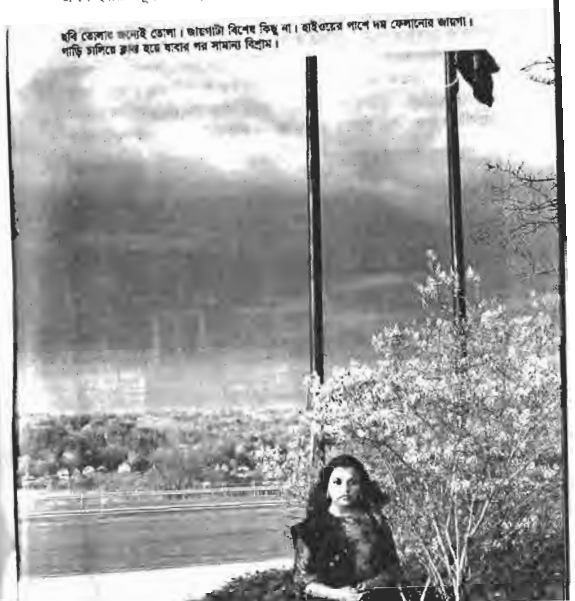
ছবি তোলার জন্যেই তোলা। জায়গাটা বিশেষ কিছু না। হাইওয়ের পাশে দম ফেলানোর জায়গা। গাড়ি চালিয়ে ক্লান্ত হয়ে যাবার পর সামান্য বিশ্রাম।

স্পন্সর। তিনি পুরস্কার দেবার সময় হাসিমুখে আপনার সঙ্গে ছবি তুলবেন। আপনার বিষয়ে এবং নিজের বিষয়ে দু'টি কথা দশটি কথাতে গড়াবে। পুরো সময়টাতে বিনয়ী ভঙ্গি করে হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে।

রাত ন'টার দিকে আমি এবং শাওন পৌঁছলাম নিউ ইয়র্কের হোটেল রেডিসনে। পুরস্কার কমিটি আমাদেরকে সেখানেই রাখার ব্যবস্থা করেছেন। হোটেল লবিতে পৌঁছে মোটামুটি বেকায়দা অবস্থায় পড়লাম। শিল্পীরা চারদিকে ঘুরঘুর করছেন। তাদের কারোর সঙ্গেই আমার তেমন পরিচয় নেই। মহিলা শিল্পীরা সবাই সঙ্গে তাদের গার্জেন নিয়ে এসেছেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মা, তারা সিরিয়াস সাজ দিয়ে ঠোঁটে লিপস্টিক ঘসে টকটকে লাল করে মহানন্দে ঘুরছেন। তাঁদের আনন্দ চোখে পড়ার মতো। শিল্পী কন্যাদের কারণে আমেরিকা ভ্রমণ বিনে পয়সায় হচ্ছে। আনন্দিত হবারই কথা। এমন গুণী মেয়ে

প্রচণ্ড ঝগড়ার পরে এই ছবি তোলা। ছবি দেখে কেউ কি তা বুঝবে? ছবি মিথ্যা কথা বলে।

পেটে ধরা সহজ কর্ম না। এই ক্যাটাগরির এক মা আবার আমাকে চিনে ফেলে কাছে এসে জানতে চাইলেন— শিল্পী যারা এসেছেন তাদের জন্যে ডেইলি কোনো অ্যালাউন্স আছে কি-না। আমি অতি বিনয়ের সঙ্গে জানালাম, এই বিষয়টি আমি জানি না। তিনি বললেন, থাকা উচিত। তিনি এর আগে মেয়ের সঙ্গে লন্ডনে পুরস্কার নিতে গেছেন, সেখানে মেয়েকে হাতখরচ দেয়া হয়েছে।

আমি বললাম, ও আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা বললেন, বুঝলেন হুমায়ূন ভাই, নিজ থেকে চেয়ে নিতে হবে। অনুষ্ঠানের আগেই নিতে হবে। অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেলে আয়োজকরা আপনাকে চিনতেই পারবে না।

আমি আবারো বললাম, ও আচ্ছা।

ভদ্রমহিলা এই পর্যায়ে নতুন কাউকে আবিষ্কার করে তাঁর দিকে ছুটে গেলেন। সম্ভবত তিনি আয়োজকদের কেউ।

অনেক রাতে আমাদের জন্যে ঘরের ব্যবস্থা হলো। জানানো হলো, গণখাবারের ব্যবস্থা আছে। কুপন দেখিয়ে খেতে হবে। কোনো এক প্রতিষ্ঠান খাবার স্পন্সর করেছে। কোথায় গিয়ে খাব, কুপনই বা কোথায় পাব, কিছুই জানি না। শাওন বলল, চল বাইরে চলে যাই। ম্যাকডোনাল্ডের হামবার্গার খেয়ে আসি। আমি খুব উৎসাহ বোধ করছি না। প্রথমত, রাত অনেক হয়ে গেছে— ম্যাকডোনাল্ড খুঁজে বের করা সমস্যা হবে। দ্বিতীয়ত, নিউ ইয়র্ক খুব নিরাপদ শহরও নয়।

আমাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন ব্যান্ড তারকা জেমস। নিজেই খাবার এনে দিলেন। আর কিছু লাগবে কি-না অতি বিনয়ের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। আমি তার ভদ্রতায় মুগ্ধ হয়ে গেলাম। তাকে বললাম, আপনার মা নিয়ে গাওয়া গানটি শুনেছি। মা নিয়ে সুন্দর গান করলেন, শাশুড়িকে নিয়ে গান নেই কেন? প্রায়ক্ষেত্রেই দেখা গেছে, শাশুড়িরা জামাইকে মায়ের চেয়েও বেশি আদর করে।

আমার কথা শুনে ঝাঁকড়া চুলের জেমস কিছুক্ষণ আমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে হঠাৎই হোটেল কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলেন। এমন প্রাণময় হাসি আমি অনেক দিন শুনি নি।

পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানটি জমকালো। লোকে লোকারণ্য। সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। আয়োজকদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা। উত্তেজনার মূল কারণ,

একজন ভারতীয় শিল্পী রাণী মুখার্জি (ছায়াছবি *ব্ল্যাক* খ্যাত) দয়া করে পুরস্কার নিতে রাজি হয়েছেন। তিনি না-কি যে-কোনো মুহূর্তে চলে আসতে পারেন। শুধু পুরস্কার হাতে তুলে নেবেন— এই কারণে তাকে বিপুল অঙ্কের ডলার দিতে হচ্ছে। এই নিয়েও আয়োজকদের দুশ্চিন্তা নেই। কারণ স্পন্সরদের মধ্যে ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে এই বিশেষ পুরস্কারটি স্পন্সর করা নিয়ে। ডলার কোনো সমস্যা না, রাণী মুখার্জির হাতে পুরস্কার তুলে দেয়ার দুর্লভ সম্মান পাওয়াটাই সমস্যা।

রাণী মুখার্জি এসে উপস্থিত হলেন। সঙ্গে বডিগার্ড। বাংলাদেশের অনেক শিল্পী এবং শিল্পীর মায়েরা আধাপাগল হয়ে গেলেন। তাদের আহ্লাদী দেখে আমি দূর থেকে লজ্জায় মরে গেলাম। একবার মনে হলো, জাতিগতভাবেই কি আমরা হীনমন্য ? কবে আমরা নিজেদের উপর বিশ্বাস ফিরে পাব ? রাণী মুখার্জিকে নিয়ে আহ্লাদীর একটা উদাহরণ দেই। আমাদের দেশের একজন অভিনেত্রী ছুটে গেলেন। গদগদ ভঙ্গিতে ইংরেজি এবং হিন্দি মিশিয়ে বললেন, আমি বিশ্বাস করছি না আমি আপনাকে চোখের সামনে দেখছি। আমার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমি আপনাকে একটু জড়িয়ে ধরতে চাই।

রাণী মুখার্জি : Please no. You can take picture.

বাংলাদেশী অভিনেত্রী : আমি কোনো কথা শুনব না। আমি আপনাকে ছুঁয়ে দেখবই।

রাণী মুখার্জি : Don't toucht me. Take picture.

বাংলাদেশী অভিনেত্রী : আপনার সঙ্গে হ্যান্ডশেক না করলে আমি মরেই যাব।

রাণী মুখার্জি নিতান্ত অনিচ্ছায় এবং বিরক্তিতে হাত বাড়ালেন। বাংলাদেশের নামি অভিনেত্রী সেই হাত কচলাতে লাগলেন।

আমি প্রতিজ্ঞা করলাম, জীবনে কখনো বিদেশে কোনো পুরস্কার নিতে যাব না। এই জাতীয় দৃশ্য দ্বিতীয়বার দেখার কোনো সাধ আমার নেই।

বাংলাদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে যেমন হীনমন্যতার ব্যাপার আছে, লেখকদের মধ্যেও আছে। তার একটি গল্প করি।

বাংলাদেশে জনৈক লেখক (নাম বলতে চাচ্ছি না) গিয়েছেন কোলকাতায়। সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দেখা করবেন। বাড়ি খুঁজে বের করে অনেকক্ষণ কলিংবেল টেপাটেপি করলেন। তাঁকে অবাক করে দিয়ে সত্যজিৎ রায় নিজেই দরজা খুললেন। তবে পুরোপুরি খুললেন না। প্রবেশপথ বন্ধ করে

"মদ এবং জুয়া উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিত উপকার আছে (?)"

দাঁড়িয়ে রইলেন। লেখক বৈঠকখানায় ঢুকতে পারছেন না। লেখক বললেন, আমার নাম ... আমি বাংলাদেশের একজন লেখক। নানান বিষয়ে বিশেষ করে শিশুসাহিত্যে আমার প্রচুর বই প্রকাশিত এবং সমাদৃত হয়েছে।

সত্যজিৎ : ও আচ্ছা।

লেখক : আমি আপনার ঠাকুরদা উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর উপর বিশাল একটি বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : ও আচ্ছা।

লেখক : আমি আপনার বাবা সুকুমার রায়ের জীবন ও কর্ম নিয়ে একটা বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : হুঁ।

লেখক : আমি আপনার উপরও একটি বই লিখেছি।

সত্যজিৎ : ধন্যবাদ।

লেখক : আপনার উপর লেখা বইটি আমি নিজের হাতে আপনাকে দিতে এসেছি।

সত্যজিৎ : আমার বাড়িটা ছোট। এত বই রাখার জায়গা আমার নেই। কিছু মনে করবেন না।

নায়েগ্রা জলপ্রপাতের দিকে যাবার প্রস্তুতি। দেখে মনে হচ্ছে না একদল অভিযাত্রী ?

সত্যজিৎ রায় ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি এই গল্পটি অনেকের কাছে শুনেছি। সর্বশেষ শুনেছি 'প্রথম আলো' পত্রিকার সাজ্জাদ শরীফের কাছে। যারা বাংলাদেশের ঐ লেখকের নাম জানতে আগ্রহী, তারা সাজ্জাদ শরীফের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : হোটেল রেডিসনের ঘর।

সময় : সকাল দশটা।

হোটেলের রুম সার্ভিসকে টেলিফোন করেছি নাশতা দিয়ে যাবার জন্যে। নিজের টাকা খরচ করে খাব, আয়োজকদের উপর ভরসা করব না। রুম সার্ভিস থেকে আমাকে জানানো হলো, বাংলাদেশের গেস্টদের যে সব ঘর দেয়া হয়েছে সেখানে রুম সার্ভিস নেই।

ভালো যন্ত্রণায় পড়লাম। নাশতার কুপনও নেই। জেমসকেও আশেপাশে দেখা যাচ্ছে না যে তার কাছে সাহায্য চাইব। এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল। কেউ যেন অতি সাবধানে দু'বার বেল টিপেই চুপ করে গেল। আর সাড়াশব্দ নেই। আমি দরজা খুলে হতভম্ব। হাসি হাসি মুখে তিন মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে। একজন 'অনাদিন' পত্রিকার সম্পাদক মাজহার। সে এসেছে বাংলাদেশ থেকে। আরেকজন অভিনেতা স্বাধীন, সে এসেছে লন্ডন থেকে। তৃতীয়জন এসেছে কানাডা থেকে, 'অনাদিন'-এর প্রধান সম্পাদক মাসুম। বর্তমানে কানাডা প্রবাসী। তারা তিনজন যুক্তি করে আমাকে কোনো কিছু না জানিয়ে একই সময় উপস্থিত হয়েছে শুধুমাত্র আমাকে এবং শাওনকে সারপ্রাইজ দেবার জন্যে।

আমরা সারপ্রাইজড হলাম, আনন্দিত হলাম, উল্লসিত হলাম। আমার জীবনে আনন্দময় সঞ্চয়ের মধ্যে এটি একটি। তারা অতি দ্রুত রেন্ট-এ-কার থেকে বিশাল এক গাড়ি ভাড়া করে ফেলল। যতদিন আমেরিকায় থাকব ততদিন এই গাড়ি আমাদের সঙ্গে থাকবে। আমরা যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাব।

কোথায় যাওয়া যায় ?

আমেরিকায় মুগ্ধ হয়ে দেখার জায়গার তো কোনো অভাব নেই। পর্বত দেখতে হলে আছে Rocky mountain, জনডেনভারের বিখ্যাত গান Rocky mountain high, সমুদ্র দেখতে হলে ক্যালিফোর্নিয়া। জঙ্গল দেখতে হলে— মন্টানার রিজার্ভ ফরেস্ট, ন্যাশনাল পার্ক। গিরিখাদ দেখতে হলে— গ্রান্ড কেনিয়ন। যে গ্রান্ড কেনিয়ন দেখে লেখক মার্ক টুয়েন বলেছিলেন, যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না সে গ্রান্ড কেনিয়ন দেখলে ঈশ্বর বিশ্বাসী হতে বাধ্য।

প্রকৃতির বিচিত্র খেলা দেখতে উৎসাহী ? তার জন্যেও আমেরিকা। আছে ওল্ড ফেইথফুল। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে বিপুল জলরাশি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উঠে আসে আকাশে। আছে যশোহা বৃক্ষ নামের অদ্ভুত বৃক্ষের বন। দেখলে মনে হবে অন্য কোনো গ্রহে চলে এসেছি। আছে ক্রিস্টাল কেভস। মাটির গভীরে বর্ণাঢ্য কৃস্টালের গুহা। দেখলে মনে হবে হীরকখণ্ড দিয়ে সাজানো। আছে প্যাট্রিফায়েড ফরেস্ট। পুরো জঙ্গল অতি বিচিত্র কারণে পাথর হয়ে গেছে। যে জঙ্গলে ঢুকলেই রূপকথার জাদুকরদের কথা মনে হয়।

কোথায় কোথায় যাওয়া হবে, কী কী দেখা হবে তা নিয়ে পুরো একদিন গবেষণার পর আমরা রওনা হলাম আটলান্টিক সিটিতে। শাওনের ধারণা হলো নিশ্চয় অপূর্ব কিছু দেখতে যাচ্ছি। সে যতই জানতে চায় আটলান্টিক সিটিতে কী আছে আমি ততই গা মুচড়ামুচড়ি করি। ভেঙে বলি না। কারণ আটলান্টিক সিটি হলো গরিবের লাস ভেগাস। জুয়া খেলার ব্যবস্থা ছাড়া সেখানে আর কিছু নেই। একজন বঙ্গললনাকে তো বলা যায় না, আমরা যাচ্ছি জুয়া খেলতে। বঙ্গললনারা সবাই 'দেবদাস' পড়েছেন। মদ এবং জুয়া কী সর্বনাশ করে তা

তারা জানেন।

পবিত্র কোরান শরীফে মদ এবং জুয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে— 'দুইয়ের মধ্যেই মানুষের জন্যে কিঞ্চিৎ উপকার আছে। তবে উপকারের চেয়ে ওদের দোষই বেশি।' (সূরা বাকারা, ২-২১৯)

সূরা বাকারার এই আয়াতটির অনুবাদ একেক জায়গায় একেক রকম দেখি। নিজে আরবি জানি না বলে আসল অনুবাদ কী হবে বুঝতে পারছি না। আরবি জানা কোনো পাঠক কি এই বিষয়ে আমাকে সাহায্য করবেন ?

অনেক অনুবাদে আছে— 'উপকারের চেয়ে ওদের অপকারই বেশি। এর পরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?'

আবার অনেক অনুবাদে 'এরপরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না ?' অংশটি নেই। এই মুহূর্তে আমার হাতে আছে মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের কোরান শরীফ সরল বঙ্গানুবাদ, সেখানে 'এরপরেও কি তোমরা নিবৃত্ত হইবে না' অংশটি নেই।

জুয়াতে যে 'কিঞ্চিৎ উপকার' আছে তার প্রমাণ মাজহার আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছামাত্র পেল। স্লট মেশিনে প্রথমবারই Jack pot, ট্রিপল সেভেন। একটা কোয়ার্টার ফেলে সে পেল সাত হাজার ইউএস ডলার। ঢাকা-নিউইয়র্ক যাওয়া-আসার খরচ উঠে গেল।

কাছের কাউকে জ্যাকপট পেতে আমি কখনো দেখি নি। ব্যাপারটায় অত্যন্ত আনন্দ পেলাম। আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হলো না, কারণ মাজহার আবারো একটি জ্যাকপট পেল। প্রিয়জনদের সামান্য উন্নতি সহ্য করা যায়। বেশি সহ্য করা যায় না। মানুষ হিংসুক প্রাণী।

আমরা কেউ মাজহারের সঙ্গে কথা বলি না। সে চৌদ্দ হাজার ডলারের মালিক। বাংলাদেশি টাকায় ১২ লাখ টাকা। মেশিনের হ্যান্ডেল কয়েকবার টেনে বার লক্ষ টাকা যে পায় তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখা অর্থহীন। আমরা যে মাজহারকে পাত্তা দিচ্ছি না সে এটা বুঝতেও পারছে না। নিজের মনে মহানন্দে নানাবিধ জুয়া খেলে যাচ্ছে— রুলেট, ফ্লাশ, স্পেনিশ টুয়েন্টি ওয়ান। জুয়া খেলার টাকার অভাব এখন আর তার নেই। বড় বড় দান ধরে সে আশেপাশের সবাইকে চমকে দিচ্ছে। আরবের শেখ গুষ্টি পর্যন্ত চমকিত।

এক ফাঁকে বলে নেই— ধর্মপ্রাণ (?) এবং ধনবান আরবদের একটি বড় অংশ আমেরিকায় আসেন জুয়া খেলতে। রুলেটের টেবিলে গম্ভীর ভঙ্গিতে বসে থাকেন। তাঁদের হাতে থাকে তসবি। সামনের গ্লাসে অতি দামি হুইস্কি। জুয়া

শাওন নায়েগ্রা জলপ্রপাত মুগ্ধ হয়ে দেখছে, এই হলো ছবির বিষয়বস্তু। তার উচিত জলপ্রপাতের দিকে তাকিয়ে থাকা, সে তাকিয়ে আছে ক্যামেরার দিকে। নায়িকা হবার এই এক সমস্যা।

এবং মদ্যপানের মধ্যেও তাঁরা মহান আল্লাহকে ভুলেন না। তসবি টানতে থাকেন।

সূরা বাকারার আয়াত মাজহারের ক্ষেত্রে খেটে গেল। সন্ধ্যা নাগাদ তার সব জেতা টাকা চলে গেল। নিজের পকেট থেকেও গেল। কত গেল এটা সে বলে না। প্রশ্ন করলে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। সে বলল, এটা শয়তানের আখড়া। শয়তানের আখড়ায় আর এক মুহূর্ত থাকা ঠিক না। আমাদের এক্ষুনি অন্য কোথাও চলে যাওয়া প্রয়োজন। আমেরিকায় এত কিছু আছে দেখার, সেইসব বাদ দিয়ে ক্যাসিনো ভ্রমণ, ছিঃ!

মাজহারের বক্তৃতায় অনুপ্রাণিত হয়ে আটলান্টিক সিটি ছেড়ে আমরা রওনা হলাম ওয়াশিংটন ডিসির দিকে। ওয়াশিংটন ডিসি হলো মিউজিয়াম নগরী। কতকিছু আছে দেখার। এক স্মিথসোনিয়ান মিউজিয়ামেই তো দু'দিন কাটিয়ে দেয়া যায়। সেখানে আছে রাইট ব্রাদার্সের বানানো প্রথম বিমান। যে লুনার

মডিউল চাঁদে নেমেছিল, সেই লুনার মডিউল। চাঁদের পাথর। যে পাথরে হাত রেখে ছবি তোলা যায়।

আমাদের গাড়ি হাইওয়ে দিয়ে ছুটছে। ঘণ্টা দুই পার হয়েছে, হঠাৎ আমাদের মনে হলো গভীর রাতে আমরা ওয়াশিংটন পৌঁছব। হোটেল ঠিক করা নেই। সমস্যা হতে পারে। সঙ্গে মেয়েছেলে (শাওন) আছে। মেয়েছেলে না থাকলে অন্য কথা। তারচে' বরং আটলান্টিক সিটিতে যাই। সেখানে হোটেলে আরামে রাত কাটিয়ে পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

আমরা আটলান্টিক সিটিতে পৌঁছেই ক্যাসিনোতে ঢুকে গেলাম। মাজহার আরো হারল।

পরদিন শাওন খুব হৈচৈ শুরু করল। মেয়েদের বেশির ভাগ হৈচৈ যুক্তিহীন হয়। তারটায় যুক্তি আছে। সে বলল, আমি জীবনে প্রথমবার আমেরিকায় এসেছি। আবার আসতে পারব কিনা তার নেই ঠিক। আমি কি স্লট মেশিনের জঙ্গল দেখে বেড়াব ? আর কিছুই দেখব না ?

তাকে শান্ত করার জন্যে পরদিন রওনা হলাম ফিলাডেলফিয়া। ফিলাডেলফিয়াতে ক্রিস্টাল কেইভ দেখব। কিছু ভুতুড়ে বাড়ি আছে (Haunted house), সে সব দেখব। ভূতরা দর্শনার্থীদের নানাভাবে বিরক্ত করে। কিছু কিছু ভূত আবার দৃশ্যমানও হয়। আমার অনেক দিনের ভূত দেখার শখ। তার জন্যে ফিলাডেলফিয়া ভালো শহর।

বিকেলে এক রেস্টুরেন্টে চা খাবার পর মনে হলো— টিকিট কেটে ভূত দেখা খুবই হাস্যকর ব্যাপার। ভূত ছাড়া এই শহরে দেখারও কিছু নেই। Crystal cave-ও তেমন কিছু না। ঝলমলে কিছু ভলোমাইট। ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করি কোথায় যাওয়া যায়।

এই ছবির শানে নজুল ভুলে গেছি। অপরিচিত কিছু লোকজন দেখছি। এরা কারা ?

শাওন বলল, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করার জন্যে সেই আটলান্টিক সিটিতেই যেতে হবে ? এখানে মাথা ঠাণ্ডা হবে না ?

আমি বললাম, অবশ্যই হবে। তবে এখানে হোটেলের ভাড়া অনেক বেশি। আটলান্টিক সিটিতে সস্তা।

আবারো গাড়ি চলল আটলান্টিক সিটির দিকে। সফরসঙ্গীরা ফিলাডেলফিয়াতে এসে মুষড়ে পড়েছিল। আবারো তাদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য দেখা গেল। স্বাধীন অতি আনন্দের সঙ্গে বলল, হুমায়ূন ভাইয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর মজাই অন্যরকম।

প্রিয় পাঠক সম্প্রদায়, আপনারা যদি মনে করেন আমরা আটলান্টিক সিটির জুয়াঘর ছাড়া আমেরিকায় আর কিছুই দেখি নি তাহলে ভুল করবেন।

আর কিছু না দেখলেও আমরা নায়েগ্রো জলপ্রপাত নামক বস্তুটি দেখেছি। প্রমাণস্বরূপ ছবি দিয়ে দিলাম। আমরা যেন পাহাড় ভেঙে নামা বিপুল জলধারা ভালোমতো দেখতে পারি, প্রকৃতির এই মহাবিস্ময় পুরোপুরি উপভোগ করতে পারি, তার জন্যে দু'দিন দু'রাত নায়েগ্রাতেই পড়েছিলাম। এখানে অবশ্যি রাজনীতিবিদদের ভাষায় একটি সূক্ষ্ম কারচুপি আছে। নায়েগ্রাতে ক্যাসিনো আছে। এদের জুয়া খেলার ব্যবস্থাও অতি উত্তম।

এলেম শ্যামদেশে

শ্যামদেশের আমি নাম দিয়েছি 'গা-টেপাটেপির দেশ'। যে-দেশের প্রধান পণ্য Massage, সে-দেশের এই নাম খুব খারাপ নাম না। 'থাই ম্যাসাজ পৃথিবীর সেরা' বলে কোনো জাতি যে অহঙ্কার করতে পারে এই ধারণাই আমার ছিল না। সব নাকবোঁচা জাতির কাছে কি এই দলাইমলাই অতি গুরুত্বপূর্ণ ? খাড়া নাকের মানুষদের মধ্যে তো এই প্রবণতা নেই।

মঙ্গোলীয় জাতি ঘোড়া নির্ভর ছিল। ঘোড়াকে প্রতিদিন দলাইমলাই করতে হতো। ব্যাপারটা কি সেখান থেকে এসেছে ? ঘোড়ায় চড়ে দীর্ঘ পথপরিক্রমায় শরীর ব্যথা। সেই ব্যথা সারাবার জন্যে ম্যাসাজ। ঘোড়া বিদায় হয়েছে কিন্তু তার দলাইমলাই রেখে গেছে, ব্যাপারটা কি এরকম ? পাখি চলে গেছে কিন্তু তার পালক রেখে গেছে।

শ্যামদেশ ভ্রমণের ব্যাপারে আমাকে প্রথম যিনি আগ্রহী করতে চেষ্টা করেন তাঁর নাম মাহফুজুর রহমান খান। আমার ক্যামেরাম্যান। ব্যাংককের 'পাতায়া' নামক জায়গার কথা বলতে গিয়ে তাঁর চোখ সবসময় ভেতর থেকে খানিকটা বের হয়ে আসে। চেহারায় 'আহা আহা' ভাব চলে আসে।

কী জায়গা! স্যার, একবার যেতেই হবে। পাতায়া না গেলে মানব জীবনের বিরাট অংশই বৃথা। স্যার, বলেন কবে যাবেন পাতায়া ? আমি যত কাজই থাকুক, আপনার সঙ্গে যাব।

এই ধরনের প্রতি উচ্ছ্বাসে কিছুটা আগ্রহ দেখানো ভদ্রতা। আমি ভদ্রতার ধারেকাছে না গিয়ে বলি— গা টেপার দেশে আমি যাব না।

মাহফুজুর রহমান খান বললেন, আপনি গা টেপাবেন না। সেখানে মসজিদ আছে। আপনি মসজিদে নফল নামাজ পড়বেন।

ব্যাংকক বিষয়ে দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস পাওয়া গেল শাওনের কাছে। মাহফুজুর রহমান 'পাতায়া'। শাওন 'ফুকেট'। ফুকেটের নীল সমুদ্র, স্কুভা ডাইভিং, দূরের নীল পাহাড়, অতি সস্তায় কেনাকাটা! ইত্যাদি।

আমার কাছে একটি গ্রন্থ আছে, নাম 'পৃথিবীর এক হাজার একটি অপূর্ব প্রাকৃতিক বিস্ময়, মৃত্যুর আগে যা দেখা তোমার অবশ্য কর্তব্য।' (1001 Natural wonders you must see before you die) বইটি প্রায়ই আমি নেড়েচেড়ে দেখি। মৃত্যু তো ঘনিয়ে এলো— এক হাজার একের কয়টায় ক্রস মার্ক দিতে পারলাম তার হিসাব। বইটিতে বাংলাদেশের একটি মাত্র এন্ট্রি—

এই সেই পিচ্চি সমুদ্র সৈকত। দেখে মনে হচ্ছে গ্রামের ঘাট। (পাতায়া)

আঁকা হচ্ছে উল্কি।

'সুন্দরবন'। যেন সুন্দরবন ছাড়া আমাদের আর কিছু নেই। মাহফুজ-শাওনের প্রায় স্বপ্নপুরী শ্যামদেশের ব্যাপারে বইটি কী বলছে দেখতে গিয়ে পাতা উল্টালাম। আমি হতভম্ব। শ্যামদেশের এন্ট্রি আছে তেত্রিশটি— কেয়ং সোফা জলপ্রপাত, ফু রুয়া রক ফার্মেশন, দুই ইনথন পর্বত...। এর মধ্যে একটা এন্ট্রি আমার মন হরণ করল— Naga Fireballs. এখানের ঘটনা হচ্ছে, প্রতিবছর এগারো চন্দ্রমাসের পূর্ণচন্দ্রের রাতে মেকং নদীর একশ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য জুড়ে নদীর ভেতর থেকে শত শত আগুনের গোলা উঠে আসে। অগ্নিগোলক টেনিস বল আকৃতির। সাড়ে তিনশ' ফুট উঁচুতে উঠে মিলিয়ে যায়। যার কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিজ্ঞানীরা দিতে পারছে না।

মৃত্যুর আগে আর কিছু দেখি না দেখি পূর্ণিমায় আগুনের গোলা দেখতেই হবে। আমি আমার ভ্রমণ বিষয়ক পোর্টফোলিওর প্রধান মাজহারকে ডেকে বললাম, ম্যাসাজ করাবে ?

সে কাচুমাচু হয়ে বলল, জি-না। ম্যাসাজের অভ্যাস আমার নেই।

এই সেই রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মুখ। যা বাংলাদেশের লেখকের পেটে স্থান করে নিল।

পঞ্চপাণ্ডবের কথা জানি— এখানে চার পাণ্ডব।

আমি বললাম, অভ্যাস নাই অভ্যাস করাবে। প্রথম প্রথম সিগারেট টানতে কুৎসিত লাগে। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে মহানন্দ। বিয়ারের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার— প্রথম চুমুকে তিতা বিষের মতো এক বস্তু, তারপর ক্যায়া মজা! যাই হোক, ব্যাংককে যাব মনস্থ করেছি। ব্যবস্থা করো।

মাজহার একদিনের মধ্যে ব্যবস্থা করে ফেলল। প্যাকেজ প্রোগ্রাম। পৃথিবী প্যাকেজের আওতায় চলে এসেছে, সবকিছুতেই প্যাকেজ।

আমরা যথাসময় ব্যাংককের এয়ারপোর্টে নামলাম। দেশের বাইরে বাংলা নামের এয়ারপোর্ট 'সুবর্ণভূমি'। বিদেশের মাটিতে পা দিয়ে আমাদের সফর সঙ্গীদের একজন আনন্দে এবং উত্তেজনার আধিক্যে বমি করে নিজেকে ভাসিয়ে ফেলল। এই সফরসঙ্গী সর্বকনিষ্ঠ, বয়স ছয় মাস। নাম অন্বয় মাজহার। ছয়মাস বয়েসি আমাদের আরেকজন সফরসঙ্গী আছে, তবে তার ছয়মাস মায়ের পেটে। শাওন তার সন্তান পেটে নিয়েই ঘুরতে বের হয়েছে। আধুনিক বিজ্ঞান বলছে মায়ের আবেগ, অনুভূতি এবং উচ্ছ্বাস গর্ভস্থ সন্তান বুঝতে পারে। সেই অর্থে শাওনের সন্তানও সফর অনুভব করছে ধরে নেয়া যায়। পেটের ভেতরে হয়তো আনন্দে খাবি খাচ্ছে।

আমি এখন পর্যন্ত যে ক'টি দেশ দেখেছি তার প্রতিটিকেই (একমাত্র নেপাল ছাড়া) বাংলাদেশ থেকে উন্নত মনে হয়েছে এবং মনটা খারাপ হয়েছে। মন খারাপের একমাত্র কারণ— আমরা এত পিছিয়ে কেন! আমার সব বিদেশ ভ্রমণ মন খারাপ দিয়ে শুরু। কী সুন্দর ঝকঝকে রাস্তা! বাই লেন, ট্রাই লেন। কী সুন্দর শৃঙ্খলা। ট্রাফিক আইন কঠিনভাবে মানা হচ্ছে। দেশে সামরিক শাসন অথচ একটি মিলিটারিও চোখে পড়ছে না। আমরা যাচ্ছি পাতায়ার দিকে। যতই যাচ্ছি ততই মন খারাপ হচ্ছে। মন ভালো হয়ে গেল পাতায়া পৌঁছে। আমার দেশের কক্সবাজারের সমুদ্রের কাছে এইসব কী? অবশ্যই ওয়াক থু। ছি ছি! এর নাম সমুদ্র? এই সেই সমুদ্র সৈকত?

মনে হচ্ছে বড় এক দিঘি। সমুদ্র সৈকত নামের জায়গাটা বস্তির মতো ঘিঞ্জি। সমুদ্র থেকে একহাত জায়গা ছেড়ে চেয়ারের গায়ে চেয়ার লাগানো। চেয়ারের মাথায় ছাতা এত ঘন যে নিচটা অন্ধকার হয়ে আছে। শত শত ফেরিওয়ালা ঘুরছে। কাটা ফল, ভাজা শুঁটকি, ডাব। গা মালিশওয়ালারা তেলের শিশি নিয়ে ঘুরছে। উল্কি আঁকাওয়ালারা ঘুরছে উল্কির ডিজিনপত্র নিয়ে। হাটবারের মতো মানুষ। এদের মধ্যে অসভ্য বুড়ো আমেরিকানরা কিশোরী

পাতায়ার সমুদ্র সফরের সর্ব কনিষ্ঠ এবং সর্ব জ্যেষ্ঠ সদস্য

ফ্লোটিং মার্কেটের দিকে যাত্রা। গোপনে বলে রাখি, ফ্লোটিং মার্কেটের বিষয়টা অতি ফালতু।

পতিতাদের সবার সামনেই হাতাপিতা করছে। নিজ দেশে এই কাজ করলে তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যেত। পয়সা খরচ করে মজা পেতে তারা এই দেশে এসেছে। তাদের চোখে এটা প্রসটিটিউটদের দেশ। সব মেয়েই প্রসটিটিউট।

পাতায়া থেকে হাজারগুণ সুন্দর আমার বাংলাদেশের সমুদ্র। কক্সবাজার, টেকনাফ, কুয়াকাটা, সেন্টমার্টিন। আর বেলাভূমি— আহারে কী সুন্দর!

পাতায়া দেখে এই কারণেই আমার মন ভালো হয়ে গেল। একবার মন ভালো হয়ে গেলে সবকিছু ভালো লাগতে শুরু করে। আমি সফরসঙ্গীদের চমকে দিয়ে গায়ের শার্ট খুলে ফেললাম। এইখানেই থামলাম না, গম্ভীর গলায় ঘোষণা করলাম, পেটে উল্কি আঁকব। আমাদের সামনে হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকা বদ আমেরিকানটাকে দেখিয়ে বললাম, ঐ ব্যাটা পেটে যে ছবি আঁকাচ্ছে সেই ছবি।

সফরসঙ্গী কমল বলল, হুমায়ূন ভাই, ঐ ব্যাটা তো পেটে নেংটা মেয়েমানুষ আঁকাচ্ছে।

আমিও তাই আঁকাব। সেও বুড়ো আমিও বুড়ো।

যখন সফরসঙ্গীরা বুঝল আমি মোটেই রসিকতা করছি না, বাংলাদেশের লেখক ক্ষেপে গেছে তখন বুঝিয়ে সুঝিয়ে রফা করা হলো— আমার পেটে

বাঘের মুখের উল্কি আঁকা হবে। রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আমি পেটে বাংলার বাঘ নিয়ে ঘুরব। উল্কি আঁকা হলো। শুরু হলো আমার শ্যামদেশ ভ্রমণ। সন্ধ্যার মধ্যে চূড়ান্ত বিরক্ত হয়ে গেলাম। হোটেলে ফিরে ঘোষণা করলাম, এখানে যা আছে দেখা হয়ে গেছে। যৌনতা প্রদর্শনীর শহর। জীবনের আনন্দ যেখানে অতি স্থূল অর্থ গ্রহণ করেছে।

মাজহার বলল, পাতায়ায় আমাদের আরো তিনদিন থাকতে হবে।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, কেন?

আমরা প্যাকেজে এসেছি। প্যাকেজে এখানে তিনদিন থাকার কথা।

তিনদিন আমি কী করব?

সবাই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। আসলেই তো তিনদিন কী করা যাবে?

দ্বিতীয় দিন একই জায়গায় শুরু হলো। একই দৃশ্য। প্রাণহীন সমুদ্র, অতিরিক্ত প্রাণময় ইউরোপের বুড়োর দল। তরুণী থাই মেয়েদের সঙ্গে লটকা লটকিতে যারা অসম্ভব পারঙ্গম।

আমাদের দলে মহিলা আছে দু'জন— শাওন এবং মাজহারের স্ত্রী স্বর্ণা। তারা শপিং-এ বের হলো। ফুটপাথ শপিং। তারাও যথেষ্ট বিরক্ত হলো। প্রতিটি দোকানে একই জিনিস। বাংলাদেশের মতো অবস্থা।

'ব্রীজ অন দা রিভার কাওয়াই' ছবিটা দেখেছেন না? পেছনে ব্রিজের রেপ্লিকা।

নৌকায় রেস্টুরেন্ট। আমরা নাশতা খাওয়া শুরু করেছি, রেস্টুরেন্ট ইঞ্জিন লোট নিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দু'পাশের অপূর্ব দৃশ্য দেখে এসেছি।

একটি জাতির মানসিকতা নাকি তাদের তৈরি খেলনা থেকে পাওয়া যায়। পথের দু'পাশে কিছুদূর পরপরই রবারের যৌনাঙ্গ নিয়ে লোকজন বসে আছে। বিক্রি হচ্ছে। অদ্ভুত এই খেলনা দেখে মাহহার পুত্র অমিয় কেনার জন্যে ঘ্যানঘ্যান শুরু করে মা-বাবা দুজনের হাতেই মার খেল। বেচারা মার খাওয়ার কারণ বুঝতে পারল না। তার মন পড়ে রইল অদ্ভুত ঐ খেলনায়।

সন্ধ্যাবেলায় ওয়াকিং স্ট্রিট নামের এক রাস্তার পাশের রেস্টুরেন্টে সবাই বসে আছি। আমি ব্যক্তিগতভাবে শঙ্কিত আরো দু'রাত কাটাতে হবে এই ভেবে, মন থেকে শঙ্কা দূর করে আনন্দে আছি এমন এক ভাব করার চেষ্টা করছি। আমাদের একজন সফরসঙ্গী আর্কিটেক্ট ফজলুল করিম শুধু অনুপস্থিত। বেচারার মন খারাপ। তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে গেছে। স্ত্রীকে নিয়ে এই পাতায়াতে সে অনেকবার এসেছে। এবার সে এসেছে একা। বাকি সবাই এসেছে সস্ত্রীক। ব্যক্তিগত পারিবারিক আনন্দ থেকে বঞ্চিত। প্রায়ই দেখি সে দল ছেড়ে একা ঘুরছে। আমাদের খারাপই লাগে। আজ সে আমাদেরকে চমকে দিয়ে হাসিমুখে উপস্থিত

হলো। তার সঙ্গে অতি রূপবতী এক থাই কন্যা। মায়াময় চোখ। উজ্জ্বল গাত্রবর্ণ। মাথাভর্তি ঘন কালো চুল।

জানা গেল, করিম এই বান্ধবী জোগাড় করেছে। সে এখন থেকে করিমের সঙ্গেই থাকবে। প্রতিরাতে তাকে পাঁচশ' বাথ দিতে হবে।

আমি অবাক হয়ে মেয়েটির নিষ্পাপ (?) মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। দলের সবাই মেয়েটির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করল। আমরা ভাব করলাম যেন সে করিমের দীর্ঘদিনের চেনা কোনো তরুণী। কিছুটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটাতে এসেছে। মেয়েটিও সহজ-স্বাভাবিক। ছয়মাসের অন্বয়কে কোলে নিয়ে আদর করছে। গল্প করছে।

এর মধ্যে মাজহার পুত্র এক খেলনা কিনে নিয়ে এলো। রিমোট কন্ট্রোলের গাড়ি। কিছুক্ষণ চলে, তারপর তালগোল পাকিয়ে যায়, আবার চলে। আমরা

শ্যামদেশের সফরসঙ্গীরা। অবয়বকে তো দেখছি না। সে কার কাছে?

সবাই খেলনা দেখে মজা পাচ্ছি। থাই মেয়েটি জানতে চাইল, খেলনার দাম কত? মাজহার বলল, পাঁচশ' বাথ।

মেয়েটি ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, Me and Toy same same 500 bath.

সরল বাংলায়— এই খেলনার সঙ্গে আমার কোনো প্রভেদ নেই। আমি এবং খেলনা একই মূল্য, পাঁচশ' বাথ।

পাতায়া ভ্রমণ শেষে আমরা থাইল্যান্ডের অনেক সুন্দর জায়গায় গিয়েছি। এক হাজার এক প্রাকৃতিক লীলা সৌন্দর্যের ছটা দেখেছি। বইয়ে ক্রস মার্ক দিয়েছি। কিছুই কেন জানি আমাকে স্পর্শ করল না। কানে সারাক্ষণ থাই মেয়েটির করুণ গলা রেকর্ডের মতো বাজতে থাকল— Me and toy same same. মানবজীবনের কী করুণ পরাজয়!

বাংলাদেশের লেখালেখির ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া....* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। জাপান টেলিভিশন NHK তাঁকে নিয়ে একটি পনেরো মিনিটের ডকুমেন্টারি প্রচার করেছে Who is who in Asia শিরোনামে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'মুহাশ পল্লী'তে।